সেচপত্র

জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০০৫

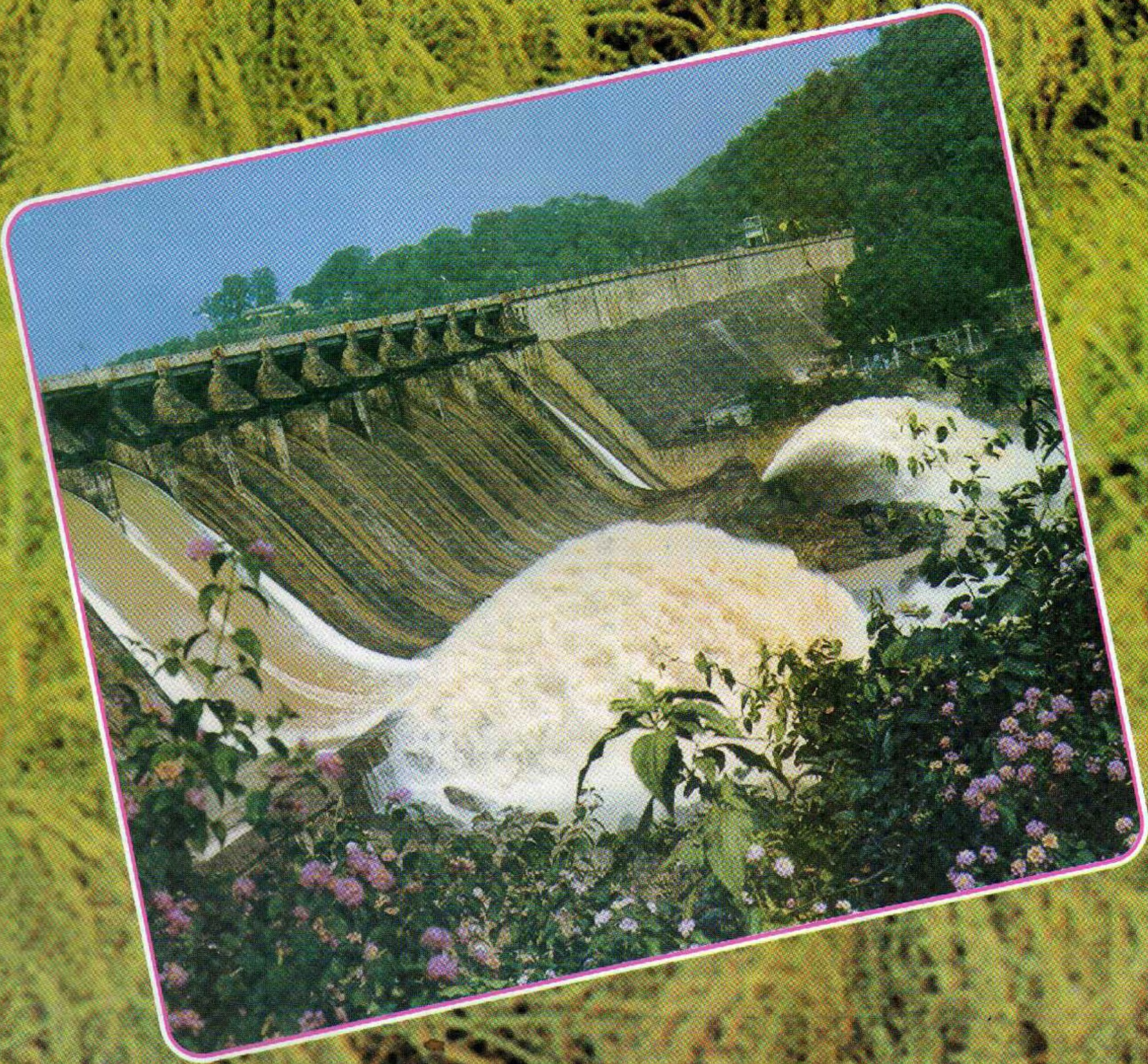

পুরুলিয়া জেলার আড়ষা থানার সামুইডহর, কুলটার, সেনাবনা ইত্যাদি মৌজাসমূহে সেচ ও জলপথ দপ্তরের বান্দু সেচ প্রকল্পের মূল খালের সিমেন্ট কংক্রিট লাইনিং দ্বারা সংস্কার। কাজের প্রয়োজনীয় টাকা *রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা* প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত। এই লাইনিং-এর ফলে জলের অপচয় অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে এবং রবি চাষের ক্ষেত্রে কিছু অধিক জমিতে চাষের সুফল পাওয়া যাবে।

ছবিতে কাজের আগে ও তার পরের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

মূল খালের ৪৫৪৫ মিঃ থেকে ৪৫৭২ মিঃ পর্যন্ত

মূল খালের ৫৩৯৬ মিঃ থেকে ৫৪৫০ মিঃ পর্যন্ত

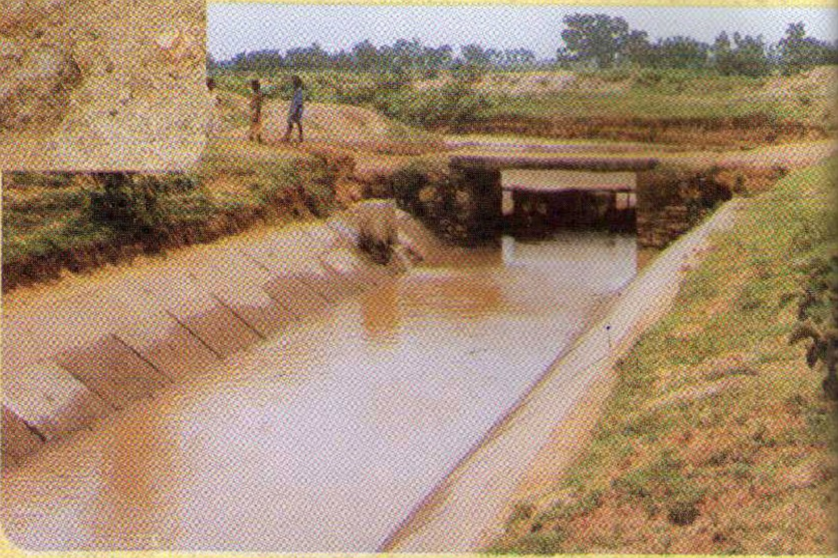

সেচপত্র

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

পাঠকের কলম

স্মরণ

(ক) প্রয়াত মন্ত্রী গণেশ মণ্ডল স্মরণে ❖ বিশ্বতোষ সরকার, সচিব, সেচ ও জলপথ বিভাগ ৭

(খ) প্রয়াত মন্ত্রী গণেশ মণ্ডল স্মরণে শোকবার্তা ৯

(গ) পুনর্মুদ্রণ : সুন্দরবনের নদী ও তার সমস্যা ❖ গণেশ মণ্ডল, প্রয়াত মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ ১০

সুন্দরবন : একটি সার্বিক মূল্যায়ন ❖ সুভাষচন্দ্র দত্ত, মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ১৩

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী আয়োগ / একটি প্রতিবেদন ❖ নিজস্ব সংবাদদাতা ১৮

দামোদর উপত্যকা প্রকল্প, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন ও কিছু তথ্য
সমরেশ কুণ্ডু, অধীক্ষক বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ১৯

উন্নয়ন / উত্তর চব্বিশ পরগনা :

ইছামতী নদী সংস্কার : পরিকল্পনা ও রূপায়ণ, একটি প্রতিবেদন ❖ নিজস্ব সংবাদদাতা ২৪

তিস্তা সেচ প্রকল্প, একবার ফিরে দেখা ❖ বৈদ্যনাথ ঘোষ, নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ২৫

জলসম্পদ : ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালনের নিরিখে বিশ্ব, ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ
অঞ্জন দাশগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ২৯

অনুকৃতি বা মডেল : জলপ্রবাহ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি
মানিক দে, উপ-অধিকর্তা, নদী বিজ্ঞান মন্দির ৩৮

উন্নয়ন / উত্তরবঙ্গ :

মহানন্দা, মহিষমারী ও পঞ্চাই নদীর বন্যা : একটি প্রতিবেদন
বাণী সাঁতরা, নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ৪২

উন্নয়ন / বর্ধমান :

ভাগীরথীর ভাঙন প্রতিরোধে বর্ধমান সেচভুক্তির ভূমিকা : একটি প্রতিবেদন
দীপককুমার মুখার্জী, অবর সহ-বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ৪৪

সেচ পরিক্রমা / জেলা পুরুলিয়া ❖ দিলীপ কর্মকার, অবর সহ-বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ৪৮

বিশ্ববিচিত্রা ❖ অঞ্জন দাশগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ৫৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র

একাদশ বর্ষ □ জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন, ২০০৫ (যুগ্ম সংখ্যা)

সম্পাদকীয় বিভাগ

সভাপতি

বিশ্বনাথ চৌধুরী

মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ

প্রধান সম্পাদক

সুভাষ চন্দ্র দে

মুখ্য বাস্তুকার-১

সংযুক্ত সম্পাদক

প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাহী বাস্তুকার

রাজকাপুর শর্মা

সহ-বাস্তুকার

অজয় রায়

সহ-বাস্তুকার

দিলীপ কর্মকার

অবর সহ-বাস্তুকার

শচীন দাশ

পরিসংখ্যান ও প্রকাশন সহায়ক

জলসম্পদ ভবন □ বিধাননগর, সল্টলেক

দূরভাষ : ২৩৫৮-০৫২৮ □ ফ্যাক্স : ০৩৩-২৩৩৪-৬২৪৫/২৩২১-৪৯২৮

ই-মেল : ce2iwd@cal3vsnl.net.in

ওয়েব সাইট : www.wbiwd.com

সম্পাদকীয়

সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র 'সেচপত্র' একাদশ বর্ষে পড়ল।

কিন্তু এ সংখ্যা প্রস্তুতির শুরুতেই আমাদের কাছে এক নিদারুণ দুসংবাদ ! আমরা আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রীকে হারালাম। মাত্র পক্ষকাল রোগভোগের পর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কেবল বিভাগীয় মন্ত্রী হিসেবেই নন, তিনি ছিলেন আমাদের এই পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সভাপতি। পত্রিকাটিকে ঘিরে তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই তিনি নানাভাবে সম্পাদকীয় কাজে আমাদের সাহায্য করেছেন। নিজে লিখেছেন এবং অন্যান্যদের সেচ ও জলপথ বিভাগের নানান উন্নয়ন ও সমস্যাবলী নিয়ে লিখে সেগুলিকে জনমানসে তুলে ধরার জন্য বলতেন। যাই হোক, আজ আর তিনি আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু এই সংখ্যায় আমরা তাঁর সুন্দরবনের নদী ও তার সমস্যা বিষয়ক একটি রচনা পুনর্মুদ্রণ করেছি। এছাড়া রয়েছে তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী থেকে বর্তমান ও প্রাক্তন অন্যান্য মন্ত্রীর শোকবার্তা এবং আমাদের সেচ ও জলপথ বিভাগের সচিবের শোকলিপি।

আলোচ্য সংখ্যায় আমরা জোর দিয়েছি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের ওপরে। তা বাদে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী আয়োগের উভয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাঙনকবলিত জায়গা পরিদর্শনের ও তা নিয়ে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মতামতের প্রতিবেদনও রয়েছে এ সংখ্যায়। রয়েছে সুন্দরবন বিষয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন।

আলোচ্য সংখ্যা থেকেই শুরু হয়েছে জেলাভিত্তিক সেচ পরিক্রমা। এ পর্যায়ে এবারে রয়েছে পুরুলিয়া জেলা। এছাড়া রয়েছে তিস্তা সেচ প্রকল্প সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা। রয়েছে জলপ্রবাহ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের বিষয়ে অনুকৃতি বা মডেলের ভূমিকা কী হতে পারে তার ওপরে। জলসম্পদের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষ বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা নিয়ে একটি সুদীর্ঘ রচনাও এবারের পত্রিকার একটি অন্যতম আকর্ষণ। তাছাড়া নিয়মিত অন্যান্য বিভাগ তো আছেই।

অন্যান্য সংখ্যার মতো এ সংখ্যারও আকর্ষণ সেভাবে বাড়বে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

পাঠকের কলম

প্রিয় সম্পাদক,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত সেচপত্রের (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪) একটি কপি সংযোগ বশত আমার হস্তগত হয় এবং প্রতিটি প্রতিবেদন পড়ি। প্রতিবেদনগুলির উপস্থাপনা, প্রয়োজনীয় নক্শা, ছবি ও পরিসংখ্যান পত্রিকাটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বিশেষ করে জ্যোতির্ময় সরকারের 'সমুদ্রোপকূলের প্রাকৃতিক বিরূপতার প্রেক্ষাপটে সুন্দরবন'—প্রতিবেদনটিতে শ্রীসরকার খুব বিস্তৃতভাবে সুন্দরবনের বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণগুলি পরিসংখ্যানের সঙ্গে যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি তার প্রতিরোধের উপায়গুলিও আলোচনা করেছেন। পরিশেষে তিনি সুন্দরবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যথেচ্ছভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস করা এবং নতুন করে উপযোগী বৃক্ষরোপণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

শ্রীঅঞ্জন দাশগুপ্তের 'শহর কলকাতা ও তার আশপাশের নিকাশি ব্যবস্থা ; অতীত ও বর্তমান'—প্রতিবেদনটিতে কলকাতা পত্তনের ইতিহাসের সঙ্গে কলকাতা শহরের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করেছেন অনুরূপভাবে তিনি বর্তমান কলকাতা শহরের নিকাশি ব্যবস্থার প্রকৃতি ও তার প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি তুলে ধরেছেন। এছাড়াও তিনি কলকাতার অন্যান্য নিকাশি খালগুলির গতিপথ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এর ফলে কলকাতা শহরের বর্তমান নিকাশি ব্যবস্থার সার্বিক চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

শ্রীদিলীপ কর্মকার তাঁর বলিষ্ঠ লেখনির সাহায্যে সুন্দরবন সৃষ্টির ইতিহাস ও তার বর্তমান অবস্থাটি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে সেচপত্রের সংখ্যাটি নিয়মিত প্রকাশের উপর গুরুত্ব দিয়ে এর সাফল্য কামনা করছি।

শ্রীঅরূপকুমার চক্রব

০২।০৪।২০০৫ ঢাকুরিয়া, কলি-৩

সেচপত্র

নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়ান

পাঠকের কলমে

আপনার মতামত

জানান

প্রয়াত মন্ত্রী গণেশ মণ্ডল স্মরণে

প্রয়াত মন্ত্রী গণেশ মণ্ডল

মাত্র ৬৮ বছর বয়সে প্রচণ্ড কর্মক্ষম অবস্থাতেই চলে গেলেন রাজ্যের সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী গণেশ মণ্ডল। হাসপাতালে প্রায় এক পক্ষকাল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকার পর গত ২৬ জুলাই ২০০৫ বেলা ৩টে ২৫ মিনিটে তিনি প্রয়াত হলেন। তাঁর প্রয়াণের খবরে রাজ্যবাসী মাত্রই শোকাহত। এবং আমাদের মধ্যেও নেমে এসেছিল গভীর এক শোকের ছায়া। কেননা বিভাগীয় মন্ত্রী হলেও তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। বিভাগীয় কাজকর্মের পরিসরে ও কখনো কখনো ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়ও তাঁকে পেয়েছিলাম অন্য এক মানুষ হিসেবে। এ বঙ্গের নদীনালা, খালবিল ও মাটি-মানুষকে তিনি চিনতেন তাঁর হাতের তালুর মতোই। কোন নদী কোথা থেকে বেরিয়ে কোথায় ও কীভাবে প্রবাহিত হয়েছে এসবই তাঁর ছিল একরকম মুখস্থ। অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই মানুষটি জনমানসে ছিলেন 'খুবই জনপ্রিয় ও কাজের মানুষ'।

সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের নেতা প্রয়াত গণেশবাবু জীবন শুরু করেছিলেন শিক্ষকতা দিয়ে। ছাত্রজীবনে পড়াশোনা করেছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রাধানগর যতীন্দ্রনাথ শিক্ষা নিকেতনে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আগে বিধায়ক হিসেবে জিতে এলেও ১৯৭৭ সাল থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন একটানা ওই কেন্দ্রেরই বিধায়ক। রাজ্যের মন্ত্রীসভায় আসেন ১৯৯১ সালে। সেচ ও জলপথ বিভাগে রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বেশ কয়েক বছর দায়িত্বে থাকার পর গত বছরই তিনি এ বিভাগের পূর্ণমন্ত্রী হন।

স্বল্পভাষী, নির্বিবাদী মানুষ হিসেবে মন্ত্রীসভায় যেমন, তেমনি বিভাগে আমাদের কাছেও তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। কাজেকর্মে যখনই তাঁর কাছাকাছি হয়েছি দেখেছি কী গভীর মনোযোগে তিনি ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করেছেন। এবং আমাদের সমস্যাটির সমাধানের জন্য সুপরামর্শ দিয়েছেন। কেবল তাই-ই নয়, সর্বস্তরের কর্মীদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। এমন মানুষের অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মাহত, আমরা শোকাহত। এ শোকের কোনো ভাষা নেই। তাঁর এই চলে যাওয়া আমাদের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

বিশ্বতোষ সরকার
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সেচ ও জলপথ বিভাগ
জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর

প্রয়াত মন্ত্রীর মরদেহে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বর্তমান সেচমন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী

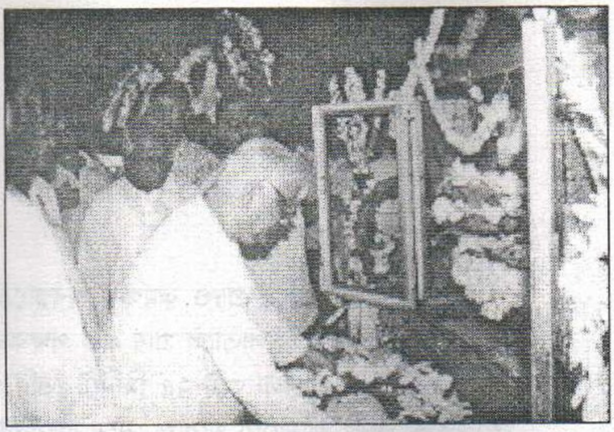

শেষ শ্রদ্ধায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী

মরদেহে পুষ্পস্তবক দিচ্ছেন বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস

পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বিধায়ক (পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা) তপন হোড়

পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সেচ ও জলপথ বিভাগের সচিব বিশ্বতোষ সরকার

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সেচ ও জলপথ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার/১ ও বিভাগীয় মুখপত্র 'সেচপত্র'-এর প্রধান সম্পাদক সুভাষচন্দ্র দে

শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন জনসংযোগ ও পরিসংখ্যান শাখা, সেচ ও জলপথ দপ্তরের অধীক্ষক বাস্তুকার সোমনাথ আগরওয়ালা

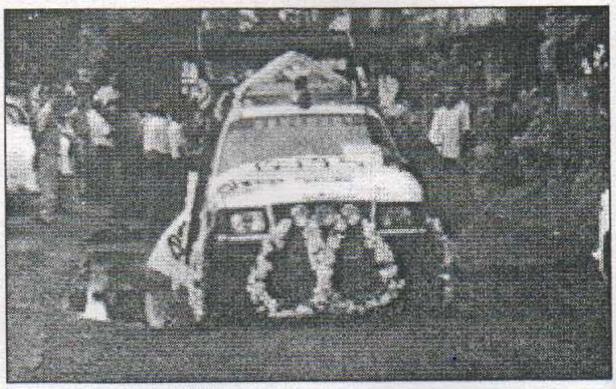

শেষ শ্রদ্ধায় বিদায়ের পথে প্রয়াত মন্ত্রী গণেশ মণ্ডল

তাঁকে নিয়ে, তাঁরই সম্পর্কে

(প্রয়াত মন্ত্রী গণেশ মণ্ডল স্মরণে)

'ওঁর মৃত্যুর সংবাদে আমি শোকাহত। কয়েকবার ওঁকে দেখেছি, ওঁর বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে জেনেছি। ওঁর পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।'

● গোপালকৃষ্ণ গান্ধী
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ
২৬ জুলাই, ২০০৫

'দুদিন আগে হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখনই ডাক্তার বলেছিলেন, অবস্থা খারাপ হচ্ছে। শেষে চলেই গেলেন। খুব সরল মানুষ ছিলেন। অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। সেচমন্ত্রী হিসেবে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। সুন্দরবন এলাকার মানুষের কাছে তাঁর রাজনৈতিক নেতা হিসেবে জনপ্রিয়তা ছিল।'

● বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
২৬ জুলাই, ২০০৫

'একজন ভালো মানুষকে হারালাম। রাজ্যের নদী-নালা ছিল তাঁর নখদর্পণে।'

● অসীম দাশগুপ্ত
অর্থমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৬ জুলাই, ২০০৫

'এই ক্ষতি অপূরণীয়। দলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ কর্মী। দলের ছোটোবড়ো সমস্ত অনুষ্ঠানে তাঁকে পাওয়া যেতই। ছোটো ছোটো কাজকেও তিনি সমান গুরুত্ব দিতেন। দল তাঁর ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল।'

● দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন মন্ত্রী
২৬ জুলাই, ২০০৫

'খুব ভালো মানুষ ছিলেন। সাদাসিধে এই মানুষকে হারালাম।'

● কিরণময় নন্দ
মৎস্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৬ জুলাই, ২০০৫

সুন্দরবনের নদী ও সমস্যা

গণেশচন্দ্র মণ্ডল

(১৯৯৭-এর জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় 'সেচপত্র'-এ রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী। রচনাটি পুণর্মুদ্রিত হল।)

—সম্পাদক, সেচপত্র

সুন্দরবনের নদী ও নদীতীরের বাঁধানো মজবুত বাঁধ

প্রাচীন মধ্যযুগে বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনিতে, ভৌগোলিক বিবরণে, মঙ্গলকাব্যে, লৌকিক কাহিনিতে বঙ্গদেশের নদীগুলির সঙ্গে সুন্দরবনের নদীগুলির বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলার নৌবাণিজ্যের পথ হিসাবে নদীগুলিই ছিল প্রধান। এই প্রদেশের দক্ষিণাংশ ছিল নিম্নভূমি। তাই পূর্ণ ছিল জলাভূমিতে। তাই এই এলাকাকে পাতাল বলে চিহ্নিত করা হত। কপিলমুনির কাহিনি তার প্রমাণ। মঙ্গলকাব্যের বর্ণনায় এটাকে আঠারো ভাটির দেশ বলা হয়েছে। একদিকে বিশাল অরণ্য, অপরদিকে সাগরের তীরবর্তী স্থান হওয়ায় মগদস্যুদের ও জলদস্যুদের অত্যাচারে জনজীবনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। সেজন্য 'মগের মুলুক' হিসাবে সুন্দরবন চিহ্নিত হয়। সত্যেন দত্ত তাই লিখেছেন—মোগলে'রে রুখেছি একহাতে, মগেরে রুখেছি আর হাতে। গঙ্গা, পদ্মা, ভাগীরথী, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদীতে হিমালয় পর্বত থেকে জলরাশির দ্বারা বাহিত, বর্জ্য পদার্থ ও বালুকণা শতাব্দীর পর শতাব্দী এসে জলাভূমিকে পূর্ণ করে তোলে। আবা উলটো দিক থেকে সাগরের জলে বাহি পলিমাটি দ্বারা স্থানটি ভরাট হতে থাকে নিম্ন জলাভূমিতে এইভাবে গড়ে ও বৃহৎ ব-দ্বীপ অঞ্চল, যার বর্তমান না সুন্দরবন।

ভাগীরথী নদীর মুখে অবস্থিত কলকাতা বন্দরের কাছে হওয়ায় বন্দ রক্ষা, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবে রক্ষার ক্ষেত্রে সুন্দরবন ও তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির গুরুত্বপূ ভূমিকা আছে। ভাগীরথী, দামোদ

রূপনারায়ণ, হলদিয়া নদীর বর্ষায় ও বন্যার সময় আগত প্রবল জলরাশির spill area হিসাবে এই এলাকার গুরুত্ব অনেকখানি। আবার বৎসরের অন্যান্য মাসগুলিতে সাগরের জোয়ারের বিপুল জলরাশি এই এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যায়।

প্রাচীন জেলা ২৪ পরগনার দক্ষিণাংশে সুন্দরবনের অবস্থান। এক সময়ে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জনবসতি ছিল। গঙ্গারিডি নামে যার পরিচয় ছিল। কিন্তু নানা সময়ে ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, ঘূর্ণিঝড়, জনজীবনে নিরাপত্তার অভাব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কারণে বসতিশূন্য হয়ে যায়।

বর্তমানে সুন্দরবনের বসতি স্থাপনের ইতিহাসও আছে। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর ২৪-পরগনা জেলার দেওয়ানী পায় লর্ড ক্লাইভ, রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের ইতিহাস—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ও মোগল সাম্রাজ্যের পতনের শেষ পর্যায়। পলাশী যুদ্ধের তেরো বৎসর পর বাংলাদেশে ১১৭৬ সালে (১৭৭০) সালে ঘটে যায় ইতিহাসের অভূতপূর্ব মন্বন্তর। বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অনাহারে মারা যায়। বেশিরভাগটাই গ্রামের মানুষ। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অনেক বেশি থাকা সত্ত্বেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহ করা ও ব্যবসার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করার জন্য অরণ্য আচ্ছাদিত সুন্দরবনকে আবাদ করার পরিকল্পনা নেয়। যশোহরের জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কল পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন ও তৎকালীন গভর্নর হেস্টিংস তা অনুমোদন করে। এই হেঙ্কল সাহেবের নামে হিঙ্গলগঞ্জ নাম হয়। বর্তমানে তা উত্তর ২৪-পরগনা জেলার একটি প্রখ্যাত গঞ্জ।

দুর্ভিক্ষের ফলে শ্রমিকের অভাব দেখা দেওয়ায় অন্য রাজ্য থেকে আদিবাসী শ্রেণির শ্রমিক আনিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৭৭০ সাল থেকে ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সুন্দরবন জরিপের আধুনিক নক্শা প্রস্তুত করে। ১৭৭৯ সালে রেনেল বিজ্ঞানসম্মত নক্শা প্রস্তুত করে। ১৮২৯ সাল থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে ডাম্পায়ের হজ্জে-সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণ করে। তাই হজেজ ডাম্পায়ের চিহ্নিত সীমারেখাকে সুন্দরবনের সীমারেখা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। জরিপের কাজ শেষ হওয়ার পর দেশি ও বিদেশি জমিদারদের সেই জমির দীর্ঘমেয়াদী ইজারা দেওয়া হয়। তাদের দায়িত্বে ছিল বাঁধ দেওয়া, তা রক্ষণাবেক্ষণ করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, গ্রামীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু জমিদাররা তা মানেনি। উপরন্তু প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করার জন্য উৎপীড়ন করা হত। ফলে জমিদার প্রজাদের বিরোধ প্রায়ই লেগে থাকত। পরবর্তী সময় তা জমিদারি প্রথা বিলোপের আন্দোলনে রূপ নেয়।

আগেই বলেছি মাটি যে পরিমাণ উঁচু হলে গ্রামগুলির উর্বরতা ও উচ্চতা বাড়ত তা আগেই অপরিণত (Immature reclamation) অবস্থায় বাঁধ দিয়ে নোনাজল আটকানোর ফলে পলি জমার সুযোগ গ্রামগুলিতে থাকে না। ফলে জোয়ারের জলের উচ্চতার অনেক নীচে গ্রামগুলি থেকে যায়। সমুদ্রের তলদেশের হিসাব ধরলে এই এলাকা নিচুতে অবস্থিত।

১৯৫৪ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার আগে প্রজারা ছিল জমিদারদের অধীন। সরকারের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক ছিল রাজস্ব প্রদানের। জমিদাররা ছিল মধ্যস্বত্বভোগী। জমিদারদের উপর নদী বাঁধ দেওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকায় কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না। কোনও প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা তা নির্মাণ করা হয়নি। গ্রামীণ লোকদের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে নদী বাঁধ নির্মাণ করা হয়। বিভিন্ন গ্রামের জমিদারি ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের হাতে থাকায় বাঁধ নির্মাণের কোনও একক (uniform) পরিকল্পনা ছিল না। ফলে নদী বাঁধগুলির কোনও সাধারণ মান ছিল না। নদী বাঁধগুলি প্রায়ই ভেঙে যেত।

অপরিণত অবস্থায় এইভাবে নদীর বাঁধ দেবার ফলে কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি হল। প্রথমত জোয়ারের জলে বাহিত পলি যা ইতিপূর্বে জমিতে জমা হয়ে জমিকে উর্বর ও উঁচু করত তা বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত জোয়ারের জলে যে পরিমাণ পলি আসে সে পরিমাণ পলি ভাটার টানে নেমে না যাওয়ায় নদীবক্ষে পলি জমে নদীর গভীরতা কমিয়ে দিচ্ছে ও নদীগুলির বুকে চড়া পড়তে থাকে। তৃতীয়ত গঙ্গার মূল স্রোত যোড়শ শতাব্দী থেকে পদ্মায় প্রবাহিত হওয়ার ফলে ভাগীরথী ও তার শাখা নদীগুলির জলের সরবরাহ কম হয়ে যাওয়ায় অনেক নদী তার আপন গতিপথ হারিয়ে ফেলে। নদীগুলি মজে যেতে থাকে। জোয়ারের জলের টানে বিপরীত দক্ষিণ দিক থেকে আগত পলিকে উপরের দিকে প্রবল স্রোতের টানে সাগরের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে নদীগুলিকে সজীব রাখত তাও বন্ধ হতে থাকে। এখন সুন্দরবনের নদীগুলি জোয়ারের জলে পুষ্ট হয়। তবে উপরের দিকে প্রবাহ না থাকায় অনেক নদী ইতিমধ্যে মজে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আদিগঙ্গা, পিয়ালী, বিদ্যাধরী, যমুনা, মাতলা, ইছামতী, কালিন্দী বা সুন্দরবনের অনেক ছোটো-বড়ো খাঁড়ি। আবার বর্তমানে করুণ অবস্থাও দেখছি। বিশাল নদী রায়মঙ্গল, কলাগাছি, মাতলা, ডাসা, হানা, গোমর, হোগল, বিদ্যা ইত্যাদি নদীতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। নদীর এক কূলে ক্রমাগত পলি ও বালি জমে বিশাল বিশাল চড়া সৃষ্টি হচ্ছে। জল বয়ে নিয়ে যাবার জন্য নদী তার পথ করে নিচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন এলাকার নদী ভাঙন, ধ্বংস হচ্ছে গ্রাম, বসতি, বাজার, গঞ্জ ইত্যাদি। এজন্য নদীর

তীরবর্তী বাঁধগুলিকে সরিয়ে আরও গ্রামের দিকে নিয়ে গিয়ে নোনা জলের প্লাবন থেকে জমি ও মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে।

রাজ্যের অন্যান্য জেলার নদীগুলির থেকে সুন্দরবনের নদীগুলির গতি-প্রকৃতি আলাদা। অন্য জেলার নদীগুলি সাধারণত বর্ষার জলে পূর্ণ হয়। কিন্তু সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের নদীগুলি জোয়ারের জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। দিনে দুবার জোয়ার-ভাটা হয়। জোয়ারের জল নদী বাঁধের গায়ে ধাক্কা দেওয়ার ফলে মাটির তৈরি বাঁধগুলির ক্ষয় হতে থাকে। প্রতি বছর মার্চ থেকে জুন-জুলাই পর্যন্ত বাতাসের প্রাবল্য থাকায় ৪৫-৫৫ কিঃ মিঃ বেগে বাতাস বয়ে যাওয়ায় নদীর জল ফেঁপে উঠে নদীগুলিতে প্রচণ্ড রকমের ঢেউ শুরু হয়। এর আঘাতে বাঁধগুলির বড়ো রকমের ক্ষতি হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতি মাসে ১০ দিন জলের মাত্রা বেশি হয়। এর উপর যদি স্বাভাবিকভাবে বাতাসের গতি বাড়ে বা ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় তবে কাঁচা বাঁধ রক্ষা করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ হয় ও মাঝে মাঝে মাটির বাঁধ ভেঙে যায়। এজন্য সারা বৎসর ধরে নদী বাঁধগুলি সংরক্ষণ করতে হয়। সুন্দরবনের নানাবিধ ফসল উৎপাদনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীবাঁধগুলির অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু নোনা জল থেকে গ্রামগুলিকে রক্ষা করা নয়। জল সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে নদীবাঁধগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে। এজন্য ওই বাঁধগুলির উপর খাল সংলগ্ন এলাকায় স্লুইস গেট বসিয়ে বাড়তি জল দ্রুত নিষ্কাশন করা হয় ও প্রয়োজনীয় বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়। সুন্দরবনের নদীবাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকলে ১/২ বৎসরের মধ্যে কোনও চাষের সম্ভাবনা থাকে না।

সুন্দরবনের নদীগুলির জলধারণের ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ও কিছু নদী মজে যাওয়ায় সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের নিকাশি ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হচ্ছে। নদীয়া বা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিরাট অংশের নিকাশি সমস্যা দেখা দিয়েছে। আবার ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে বিভিন্ন জেলার নদীগুলি ও গ্রামগুলি যখন জলে পূর্ণ হয়ে যায়, সেই জলরাশিও সুন্দরবনের নদীগুলির মধ্য দিয়ে সাগরে পড়ে। কিন্তু যখন জোয়ারের প্রবল জলধারা উলটোদিকে প্রবাহিত হয়, তখন বন্যার জল কমে নামতে থাকে। ফলে, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ইত্যাদি জেলার গ্রামগুল দীর্ঘদিন জলমগ্ন থাকে। কারণ, ভাটার টানে তখন কম জলই নামতে থাকে। রূপনারায়ণ, অজয়, দামোদর, জলঙ্গী ইত্যাদির বন্যার জল একমাত্র ভাগীরথী দয়েই সাগরে নামে।

সুন্দরবনসহ সমগ্রবঙ্গের নদীগুলির অপমৃত্য নানা কারণেই ঘটছে। সুন্দরবনের নদী ও তার গুরুত্বপূর্ণ বাঁধগুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে গতানুগতিক পদ্ধতিই গ্রাহণ করা হয়। কিন্তু নদীর গতি, স্রোত, জল ও পলির পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য কোনও তথ্য সংগ্রাহের পদ্ধতি নেই। না থাকার ফলে ভবিষ্যতে কোন নদীর কী অবস্থা হতে পারে তা জানা যায় ন জোয়ার-ভাটার যে পরিমাণ করা হ তাও আধুনিক কোনও পদ্ধতিতে হয় ন যার ফলে বাস্তবের সঙ্গে ওই পরিমাপে কোনও মিল হয় না।

নদী ও তার বাঁধগুলি রক্ষণাবেক্ষণে জন্য কিছু কর্ম পরিকল্পনা নেও প্রয়োজন। নদীগুলি সম্পর্কে ব্যাপ সমীক্ষা চালিয়ে ভবিষ্যতে কোনও প্রক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে আগেই নির্ধারণ করতে হবে। সা বৎসর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোথায় কাজ করতে হবে তা আগেই প্রস্ত করতে হবে ও শুখা মরসুমে সব কা শেষ করতে হবে। যেখানে নদী ও বাঁধে মধ্যে ভালো চর আছে সেখানে লাগানো যেতে পারে যাতে নদীর সরাসরি বাঁধে আঘাত না লাগতে পা জমিদারি আমলে সমস্ত নদীর চরে ছিল যার ফলে বাঁধগুলি কিছুটা সুরক্ষি থাকত। কাজের মানের দিকেও দৃ দিতে হবে। বাঁধগুলির যাতে ক্ষতি হয় তার জন্য জনসচেতনতা গ তুলতে হবে। ভবিষ্যতে নানা প্রক জটিলতা এড়ানোর জন্য বর্তমা সামগ্রিকভাবে নদীগুলি সংরক্ষণ কর দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজ হয়ে পড়েছে।

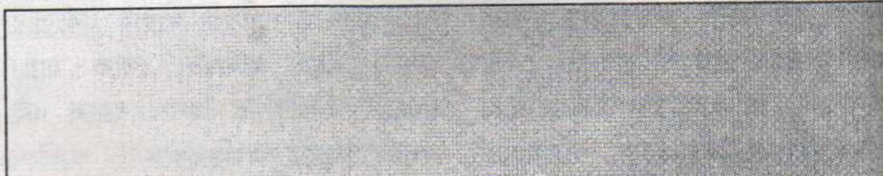

জোয়ার ও ভাটা নিয়ে নদী চলেছে সাগরের দিকে

সুন্দরবন : একটি সার্বিক মূল্যায়ন

সুভাষচন্দ্র দত্ত

সারিবন্দী ম্যানগ্রোভের জঙ্গলসহ সুন্দরবনের নদীবাঁধ

ভূমিকা

ভূ-পৃষ্ঠের চরিত্র, জলবায়ু এবং জশগত ব্যাপক বৈচিত্র্যের কারণে ভারতবর্ষের সবকটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ভৌগোলিক অবস্থানে এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে। রাজ্যের উত্তরে বরফাচ্ছাদিত হিমালয় ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অপার জলরাশি। ভৌগোলিক ও ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্নতার কারণে এ-রাজ্যকে মোটামুটিভাবে তিনটি পৃথক অঞ্চলে ভাগ করা যায়—উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ। উত্তরবঙ্গ যেমন ৬টি জেলা নিয়ে গঠিত, তেমনি ৭টি জেলা নিয়ে মধ্যবঙ্গ গঠিত হয়েছে, আর বাকি ৬টি জেলা—যেগুলি হল মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে।

ভারতবর্ষ ও প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী প্রণালী-বাহিত পলি দিয়ে গঠিত যে অসংখ্য ব-দ্বীপসমষ্টি অঞ্চল তাই হল সুন্দরবন। পশ্চিমে একে ঘিরে রেখেছে হুগলি নদী, পুবে পদ্মা-মেঘনা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় ২৫ লক্ষ হেক্টর যার মধ্যে ৩৮.৫২ শতাংশ অর্থাৎ ৯.৬৩ লক্ষ হেক্টর ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত এবং বাকি অংশ বাংলাদেশে। বাংলাদেশের সুন্দরবন-খুলনা ডিভিশানের অন্তর্গত সাতক্ষিরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলাগুলি নিয়ে। ভারতীয় অংশের সুন্দরবন পশ্চিমে হুগলি নদী ও পুবে ইছামতী-কালিন্দী-রায়মঙ্গল নদীগুলির মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে। সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে ১৮৩১ সালের ডাম্পিয়ার হজেস লাইন দিয়ে। ব্রিটিশ শাসনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন সুন্দরবনের কমিশনার উইলিয়াম ডাম্পিয়ার এবং তাঁর অধীনে কর্মরত সার্ভেয়ার লেফটেন্যান্ট হজেসের যৌথ জরিপ পরিকল্পনায় নির্ধারিত হয়েছে ওই রেখা।

বিগত প্রায় এক শতক ধরেই এটা লক্ষ করা গেছে যে নদী প্রণালীর ব-দ্বীপ গঠন প্রক্রিয়া পূর্ব দিকে বাংলাদেশের সুন্দরবনাঞ্চলে অনেক বেশি সক্রিয়। ভারতভুক্ত সুন্দরবনের তুলনায় বাংলাদেশের সুন্দরবনের নদীর মোহনাগুলি সাধারণত অনেক বেশি প্রশস্ত। ভারত এবং বাংলাদেশে সুন্দরবনের নদীগুলি প্রবাহিত হয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। লক্ষ করে দেখা গেছে যে যেহেতু পূর্বদিকে নদীগুলির ব-দ্বীপ গঠন প্রক্রিয়া অনেক বেশি সক্রিয়, সেহেতু সুন্দরবনের পুব থেকে পশ্চিমদিকে একটা আড়াআড়ি ঢাল ক্রমশ গঠিত হচ্ছে। আর পশ্চিমাংশে বেশি পলি না থাকায় পুবদিকটি ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠছে।

গত কয়েক দশক ধরেই ফরাক্কা ব্যারেজের উজানে মালদা জেলায় গঙ্গা নদীর বাঁদিকে একটি পাড় ভাঙার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। যদি গঙ্গা সত্যিই ক্রমাগত বাঁদিক ভেঙে ফরাক্কা ব্যারেজকে এড়িয়ে ঘুরপথে পাগলা-কালিন্দী নদীখাত দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে গঙ্গার বেশিরভাগ জলপ্রবাহই ভিন্নমুখী হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী প্রণালীতে পড়বে, ফলে ভারতভুক্ত সুন্দরবনাংশে উপর থেকে জলের জোগানে ঘাটতি দেখা দেবে। ভারতভুক্ত সুন্দরবনের বেশিরভাগ অঞ্চলই বাংলাদেশের সুন্দরবনের তুলনায় যত বেশি নিচু হয়ে পড়বে, ভারতীয় সুন্দরবনে সুনামির মতো একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি ততই বেশি হয়ে দাঁড়াবে। আপাত বিপদসঙ্কুল সুন্দরবনের জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে এই ধরনের ভয়াবহ প্রাকৃতিক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা বাড়বে এবং সুন্দরবনের ভঙ্গুর জীবমণ্ডল ও ব্যাঘ্র প্রকল্পের সংরক্ষিত অঞ্চল এর ফলে আরও বিপন্ন হয়ে পড়বে। কেবল তাই-ই নয়, দ্বীপপুঞ্জের এই নৈকট্যের কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী খোদ কলকাতার দোরগোড়ায়ও যে বিপর্যয় হানা দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুন্দরবন এশিয়ায় তো বটেই এমনকি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম নদী ব-দ্বীপ। এই ব-দ্বীপগুলি প্রধানত গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদী প্রণালীর ভাগীরথী-হুগলি ও পদ্মা-মেঘনা নদীবাহিত পলি জমে জমে গড়ে উঠেছে। সমুদ্রবাহিত জোয়ারের জল অনবরত পেছনে উজিয়ে এসে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব ব-দ্বীপ গঠনে সাহায্য করেছে। এ অঞ্চলের জলবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ের পরিবর্তনশীলতার কারণে গঠনগত দিক থেকে সুন্দরবন খুবই গতিময় ও জীবন্ত এক ব-দ্বীপের সমষ্টি। এখানকার অসংখ্য নদী, নদীশাখা, নদীর মোহনা, বিভিন্ন ধারণ ক্ষমতাযোগ্য খাল ও খাঁড়ি আড়াআড়িভাবে অনবরত উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে জায়গাটিকে একটি গোলকধাঁধার রূপ দিয়েছে। এই জায়গা এমন এক অঞ্চল যেখানে ভূমি এবং সমুদ্র নিরন্তর পরস্পরের স্থিতিশক্তি পরীক্ষায় ব্যস্ত। সুন্দরবন তার অনন্য অবস্থানের কারণে এমনিতেই কিছু বিরল পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত, এই সুন্দরবন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হতে পারে কিছুদিন আগেই ঘটে যাওয়া ওইরকমই এক কোনো সুনামির তাণ্ডবে, যে সুনামি কিছুদিন আগেই ঘটে গেছে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে এবং যার বিধ্বংসী তাণ্ডব অনুভূত হয়েছে গত ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর। কাজেই এরকম অতুলনীয় জট-পাকানো জলাভূমি, খাঁড়ি ও পলি যা নিয়ে সুন্দরবন, সেখানে বিপর্যয়ের মাত্রাটা হবে অকল্পনীয়।

১৯৮৭ সালে ইউনেসকো (UNESCO) ভারতীয় অংশের সুন্দরবনের অন্তর্গত, ব্যাঘ্র প্রকল্পের সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে যে জাতীয় উদ্যানটি আছে তাকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' বা 'পৃথিবীর ঐতিহ্যশালী অঞ্চল' হিসেবে ঘোষণা করেছে। উপরন্তু, ২০০১ সালে ইউনেসকো সুন্দরবন অঞ্চলকে 'বিশ্ব জীবমণ্ডল সংরক্ষণ অঞ্চল' (Global Biosphere Reserve) বলেও চিহ্নিত করেছে।

আলোচনার সুবিধের জন্য, মূল বিষয়ে ঢোকার আগে সুন্দরবন সম্পর্কিত কিছু তথ্য এখানে সংযোজন করা হল :

ভারতভুক্ত সুন্দরবনের অবস্থান □
অক্ষাংশ : ২১০-০৩' উত্তর ও ২২-০৩' উত্তর
দ্রাঘিমা : ৮৮°-৫১' পূর্ব থেকে ৯১-০৩' পূর্ব

এলাকা □ ৯৬২৯ বর্গ কিমি (জনবসতি ৪৪৯৩ বর্গকিমি/বাকি অংশ সংরক্ষিত বনাঞ্চল)

দ্বীপপুঞ্জ □
বসতিপূর্ণ = ৫৪
বসতিহীন = ৪৮
মোট = ১০২

জনসংখ্যা □ প্রায় ৪২ লক্ষের সামান্য বেশি (২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ৩৭.৫৬ লক্ষ)

জনবসতির ঘনত্ব □ ৯৩০ প্রতি বর্গ কিমিতে (সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গড় জনবসতি ৯০৪ প্রতি বর্গ কিমির পরিপ্রেক্ষিতে)

সুন্দরবনের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে পিছিয়ে-পড়া মানুষ □
তপশিলভুক্ত সম্প্রদায় = ৩৯.০৪%
তপশিলভুক্ত সম্প্রদায় = ৫.০৬%
মোট (প্রায়) = ৪৫.০০%
(যেখানে রাজ্যের মোট তপশিল জাতি ও উপজাতি প্রায় ২৮.৫%)

চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি □ ৩.০৫ হেক্টর

সীমিত সেচ সুযোগের মাধ্যমে দো-ফসলি চাষযোগ্য জমি □ ১৫-১৭%

সাব-ডিভিশান □ ৫ : দক্ষিণ ২৪-পরগনা = ৪
উত্তর ২৪-পরগনা = ১

পুলিশ স্টেশন □ ১৬ : দক্ষিণ ২৪-পরগনা = ১১
উত্তর ২৪-পরগনা = ৫

গ্রাম পঞ্চায়েত □ ১৯০ : দক্ষিণ ২৪-পরগনা = ১৪০
উত্তর ২৪-পরগনা = ৫০

ব্লক ◻	১৯ :	দক্ষিণ ২৪-পরগনা = ১৩ [৩৩৭০.০৮ বর্গ কিমি]
		উত্তর ২৪-পরগনা = ৬ [১০৭৪.২৫ বর্গ কিমি]
গ্রাম ◻	১০৬৪ :	দক্ষিণ ২৪-পরগনা = ৭৩০
		উত্তর ২৪-পরগনা = ৩৩৪
ম্যানগ্রোভ বন্যাঞ্চল ◻		৪.২ লক্ষ হেক্টর (বাংলাদেশ-সহ মোট ১০.২৮১ লক্ষ হেক্টরের মধ্যে)
বন্যা নিয়ন্ত্রণকারী নদী এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী বাঁধের দৈর্ঘ্য ◻		৩৫০০ কিমি
নিকাশি স্লুইসের সংখ্যা ◻		১০৫১ (সেচ ও জলপথ বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ= ৮৬২ সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যদের রক্ষণাবেক্ষণে= ১৯০)

ভৌগোলিক আঙ্গিক এবং সমস্যা :

সুন্দরবনের মূল সমস্যাটি হল, পূর্ণ-উচ্চতা প্রাপ্তির আগেই জমিগুলির পুনরুদ্ধার—এদিকে নদীগুলি তখনও তাদের ব-দ্বীপ নির্মাণের প্রক্রিয়ায় রত। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী পলি জমে জমে দ্বীপগুলি যখন গড়ে উঠছে ঠিক তখনই, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এখানে জনবসতি গড়ে উঠার ধুম পড়ে যায় এবং মানুষও প্রকৃতিকে দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। অথচ এ-কথা আমাদের ভালোই জানা যে, প্রকৃতির দু-দুটো রূপ। একদিকে সে উদার ও দয়ালু এবং অন্যদিকে সে ভয়ংকর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ। কাজেই সুন্দরবনে প্রকৃতি নিশ্চয়ই প্রশান্ত চিত্তে নদীগুলির এই ব-দ্বীপ নির্মাণের প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি। বরং যেটা অত্যন্ত বেশি করেই স্পষ্ট, সুন্দরবনকে ঘিরে থাকা জলরাশির নিরবচ্ছিন্নভাবে দ্বীপের জমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে অনবরতই সোচ্চার। কয়েকশো বছর আগে সমগ্র সুন্দরবন ছিল ঘন জঙ্গল ও গাছপালায় আবৃত। ব্রিটিশ শাসনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উৎসাহে কিছু বে-সরকারি উদ্যোগী, যাদের বেশির ভাগই প্রাক্তন জমিদার, তাদের জমিদারী বিস্তারের পূর্ণ সুযোগ নিয়েই ওইসব অর্ধসমাপ্ত ব-দ্বীপগুলি জলের গ্রাস থেকে পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই জোয়ারের জলে দ্বীপগুলি ডুবে থাকত বলে তাদের প্রথম কাজ হিসেবে তারা নদী, নদীর মোহনা ও জোয়ার জলের খাড়িগুলির চারপাশে বাঁধ দেবার পরিকল্পনা করেছিল। ফলে প্রান্তিক ওই বাঁধগুলির জন্ম হয় এবং এ ব্যাপারে তাদের লক্ষ্যই ছিল যতটা সম্ভব পুনরুদ্ধার করা জমিকে সর্বাধিক ব্যবহারিক কাজে লাগানো। আর বাঁধগুলি এমনভাবে তৈরি করেছিল যাতে পুনরুদ্ধার করা জমিকে সর্বাধিক ব্যবহারিক কাজে লাগানো। আর বাঁধগুলি এমনভাবে তৈরি করেছিল যাতে পুনরুদ্ধার করা অঞ্চল বড় হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন জোয়ার-ভাঁটা প্রবণ নদীর অংশে পলি পড়ার জন্য নদীর ঠিক তীরবর্তী অঞ্চল সামান্য একটু উঁচু হয়ে পড়ে এবং নদী থেকে যত দূরে যাওয়া যায় জমি ক্রমাগত নীচু হতে থাকে। নদীর ধার ঘেঁষা অপেক্ষাকৃত এই উঁচু জায়গাগুলিই প্রান্তিক বাঁধ তৈরির সময় স্বাভাবিকভাবেই বাঁধের নির্মাণ পথের দিকনির্দেশকের কাজ করে। নদীর তীর ঘেঁষে এ-সব বাঁধ কেবল নদীর একবারে ধারেই যে তৈরি হয়েছে তা নয়, এগুলি ছিল খুবই অবৈজ্ঞানিক ও মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাবস্থায় ফসল, যেগুলি রক্ষা করা ওখানে বসবাসকারী প্রজন্মের কাছে হয়ে দাঁড়ায় খুবই কঠিন।

জমি পূর্ণ-উচ্চতা পাওয়ার আগেই তার পুনরুদ্ধার এমনই এক অপরিকল্পিত ও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার মধ্যে প্রসূত ছিল যে, অনেক জটিল সমস্যা এরপর তৈরি হতে থাকে—যেমন নিকাশিজনিত তীব্র সমস্যা, বাঁধগুলির দুর্বল অংশে মাঝেমাঝেই ভাঙন, মাঝেমাঝেই কৃষিজমি দীর্ঘকাল ধরে জলমগ্ন হয়ে থাকা ও জমিতে নোনা জল ঢুকে জমির ফসল নষ্ট করা। রাজ্যের জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ প্রচণ্ড থাকার কারণে পুনরুদ্ধার করা এসব জমিতে স্বাভাবিকভাবেই অপরিকল্পিতভাবে জনবসতি শুরু হয়ে যায়। যারা বসতি স্থাপন করেছিল তারা এসব অঞ্চলের জমির উর্বরতায় যেমন আকৃষ্ট হয়েছিল তেমনি এখানকার মূল্যবান বনজ সম্পদের লোভেও পড়েছিল।

প্রাত্যহিক জোয়ারের ফলে সুন্দর-বনের এসব অঞ্চলের সমুদ্র তীরভূমি অঞ্চল, বিভিন্ন খাড়ির প্রান্তিক চরজমিসহ ছোটো ছোটো জায়গাগুলিতে ও নদীপাড়ের ঢাল, নদী, খাল ও খাড়িতে বছরভর দিনে দুবার করে জোয়ারভাটা খেলে। জোয়ারের সময় সব ডুবে যায় আবার ভাটার সময় সমুদ্রের জল নেমে গেলে সবকিছু জলের ওপর জেগে ওঠে। সুন্দরবনের খাড়িগুলিতে গড়পড়তা জলস্তর ওঠানামার পরিমাণ ৩.৫ মিঃ থেকে ৪.০০ মিঃ। বছরের অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বর্ষার মরশুমে এই জোয়ার সর্বাধিক আকার ধারণ করে, আবার বর্ষা পরবর্তী সময়ে মার্চ-এপ্রিল মাসে তা তীব্রতা পায়। অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের মরশুমে যখন জোয়ারের পরিমাণ ৪.০০ মিটারের বেশি হয়ে ওঠে তখনই সাধারণত জলতলের সর্বাধিক ওঠানামা লক্ষ করা যায়। নীচের দিকে, নদী যেখানে গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে সেখানকার গড়পড়তা জোয়ারের জলতলের তুলনায় বেশিরভাগ বসতিপূর্ণ নিচু দ্বীপগুলির অবস্থান অপেক্ষাকৃতভাবে আরও নিচু। কাজেই ওইসব দ্বীপের

জলমগ্নতা, জীবন ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত বাঁধের প্রয়োজন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ওই সমস্ত প্রান্তিক বাঁধগুলি যেগুলি ভূ-স্বামীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সেগুলির পরিবর্তন সাধন করা হয়। তবে কখনই সেখানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোনো উন্নততর প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়নি। কাছাকাছি পাওয়া যায় এমন জিনিসপত্র জোগানের মাধ্যমেই করা হয়েছিল।

সুন্দরবনের নদী বাঁধগুলির ফাটল ও ভাঙন এখানকার ব-দ্বীপ প্রণালীতে নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। বাঁধের ফাটল ধরে বাঁধ টপকে ও হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় নোনা জল ঢুকে নিম্নলিখিত বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। যেমন :

(১) চাষযোগ্য জমি ও ফলিত শস্যের ক্ষতি।

(২) জমিতে লবণাক্ত জলের প্রভাবে পরবর্তী বছরগুলিতে চাষের খেতে শস্য না হওয়া।

(৩) লবণাক্ত জলের সংস্পর্শে এসে মিষ্টি জলের দূষণ এবং ওই জলকে মানুষ ও জীবজন্তুর অপেয় করে তোলা।

(৪) কাঁচা ও আধপাকা বাড়ির ধ্বংসসাধন।

(৫) জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পানীয় জলের একমাত্র উৎস নলকূপগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়া।

(৬) রাস্তা, জেটি, পায়ে হাঁটা সেতুসমূহ, বাজার, সেচ ও নিকাশি ব্যবস্থার পরিকাঠামোগুলির ক্ষতি।

(৭) প্রাণীসম্পদের ক্ষতি এবং পরবর্তীকালে মড়ক।

(৮) মানবজীবন হানি।

(৯) উপদ্রুত অঞ্চলে বসবাস-কারীদের বহুল পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি, বিশেষত যাঁরা কৃষি, ফুলচাষ, মৎস্যচাষ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও স্থানীয় হস্তশিল্পে জীবিকানির্বাহ করেন।

(১০) চাষযোগ্য ও বাস্তুজমির ক্ষতির জন্য অঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারগুলির অপরিমেয় ক্ষতি।

(১১) কৃষি জনমজুর ও ভূমিহীন পরিবারের কাজ না থাকা।

(১২) শস্য এবং জীবিকার ক্ষতির কারণে অঞ্চলের অধিবাসীদের কর্মহীনতা ও ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি।

জনবসতিপূর্ণ এলাকায় নোনাজলের অনুপ্রবেশের বিপর্যয়কারী প্রভাবের ফল কাছাকাছি বনাঞ্চল ও জলসম্পদের ওপরও পড়ে। কেননা আক্রান্ত মানুষ নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে ওইসব বনজসম্পদ ও জলসম্পদ অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। ফলে এ অঞ্চলের স্পর্শকাতর জীবমণ্ডল ভীষণভাবে ভারসাম্যহীনতার শিকার হয়ে পড়ে ও দীর্ঘস্থায়ী এক প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

অর্থনীতি:

দূরস্থিত হওয়ার কারণে ও সহজ সংযোগের অভাবে সুন্দরবনের এসব অঞ্চলকে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রূপরেখার আওতায় ঠিক তুলে আনা যাচ্ছে না। যোগাযোগে নদী বরাবর জলপথই এ অঞ্চলে মুখ্য ভরসা। এটা সত্যি যে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুততর যাতায়াতের খাতিরে পুরনো দেশি নৌকা ছেড়ে এসব অঞ্চলে বর্তমানে যন্ত্রচালিত নৌকা পরিবহন পদ্ধতি চালু হয়েছে, কিন্তু কোনও উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাই অভিশাপবিহীন নয়। অভিশাপ ছাড়া উন্নতি বুঝি কোনো লক্ষণই নেই। সময়ের মূল্য যত স্বীকৃত হচ্ছে বর্তমানে, মানুষের ব্যস্ততাও তত বাড়ছে এবং তারই প্রভাবে এসব অঞ্চলের মানুষও যে ক্রমশ তৎপর হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কী ! কাজেই যান্ত্রিক নৌকায় তার বহন ক্ষমতার তুলনায় অতিরিক্ত লোক উঠে পড়া এ অঞ্চলের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ফলে ভিড়ে ঠাসা দ্বীপমধ্যবর্তী যাতায়াত করা যন্ত্রচালিত নৌকাগুলো প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তার ওপর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বাতাসের প্রবল ঢেউয়ের প্রভাবে এ সমস্ত নৌকা উল্টে যাওয়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সুন্দরবনে এ চিত্র তো একটি গতানুগতিক ঘটনা।

সুন্দরবনে মানুষের বসবাস যে খুবই কঠিন এক অবস্থার মধ্যে এ কথা আজ আর স্বীকার না করে উপায় নেই। বর্ষার মরশুমে যোগাযোগের অভাব, ঝড়ঝঞ্ঝাপ্রবল এলাকাসহ জোয়ারের নদী ও সমুদ্রের পাশাপাশি, নিচু এলাকায়ই বেশিরভাগ মানুষের বাস। ফলে পরিকাঠামোও নেই তেমন। এমনই এক অপ্রতুল পরিকাঠামোর ভেতরে সুন্দরবনের মানুষের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। চাষবাস ছাড়া আছে আরও কিছু সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম। যেমন : মৎস্য চাষ ও মাছ ধরা, দূরবর্তী অঞ্চলে জলজ চাষ, প্রাণিসম্পদ বিকাশ, মধু সংগ্রহ, তালের রস ও জ্বালানি সংগ্রহ ইত্যাদি। সুন্দরবনের প্রধানতম খাদ্যশস্য হল আমন ধান, যা কিনা পুরোপুরি আকাশের বৃষ্টির ওপরই নির্ভরশীল। এ ধরনের ধান চাষ ছাড়াও এ অঞ্চলের অর্থনীতি বিকাশের আর একটি বিশেষ দিক, ফলের চাষ। স্থানীয় চাষীদের খেতে শাকসবজি উৎপাদিত হয়ে রোজগারের উৎস তৈরি। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তরমুজ, লঙ্কা, তৈলবীজ ও ডাল ইত্যাদি।

রাজ্যের ও দেশের গড় জাতীয় আয়ের তুলনায় এখানকার মোট গড়পড়তা আয় খুবই কম, যা দেশের দারিদ্র্যরেখার নীচেই বলেই ধরা যেতে পারে।

প্রতিকারের কিছু পদক্ষেপ :

বর্তমান অবস্থা থেকে এ অঞ্চলকে বাঁচাবার জন্য যে যে কাজ করা যেতে পারে তা এরকম :

(ক) অবস্থানগত দূরত্ব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনার নিরিখেই এই অঞ্চলের জন্য যথোপযুক্ত ভৌগোলিক তথ্য প্রণালীর প্রণয়ন একান্ত প্রয়োজন।

(খ) নদী পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতিসাধন এবং দ্বীপগুলিতে অভ্যন্তরীণ

যোগাযোগের জন্য রাস্তা, কালভার্ট, পায়েচলা সেতু, ছোটো সেতু ও জেটি নির্মাণ।

(গ) উন্নততর পরিষেবা পাওয়া এবং ব্যর্থতা এড়ানোর জন্য বাঁধ ও নিকাশি স্লুইসগুলিকে কড়া নজরদারিতে রাখা প্রয়োজন। বাঁধ ঘেরা দ্বীপঅন্তবর্তী অঞ্চলে যে সমস্ত নিকাশি অবরোধ থাকে সেগুলি দূর করা। বন্যা নিরোধক বাঁধগুলিকে দরকারমত মজবুত ও উঁচু করা এবং বাঁধের দিকের ঢালগুলিতে অপক্ষাকৃত শক্ত আস্তরণ দিয়ে মুড়ে দেওয়া, যাতে বাঁধ না ভাঙে, নদীর জল যাতে বাঁধ টপকে সংরক্ষিত অঞ্চলে ঢুকতে না পারে, অথবা ঝড়ঝঞ্ঝা বা জোয়ারের জলের ঢেউয়ের আঘাতে তা ধুয়ে মুছে না যায়।

(ঘ) নদীর নিজস্ব চরিত্র অনুযায়ী তার প্রবাহ বিঘ্নিত না হওয়ার জন্য বিভিন্ন তথ্য নিয়ে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণসহ প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে রিঙ বাঁধ (রিটায়ারড বাঁধ) নির্মাণ করা।

(ঙ) সুন্দরবনের বাঁধই এ অঞ্চলের জীবনরেখা। এ অঞ্চলের বাঁধ ও নিকাশি স্লুইসগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার তুলনায় যে অর্থের জোগান দেওয়া যায় তা খুবই অপ্রতুল। দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। এ ধরনের কাজগুলি সেচ ও জলপথ বিভাগের বাজেটের যোজনা বহির্ভূত খাত থেকেই করা হয়ে থাকে। যদি সেচ ও জলপথ বিভাগের বাজেটের যোজনা বহির্ভূত খাত থেকে এ কাজে আরও অর্থ না পাওয়া যায় তাহলে সুন্দরবন সবসময়ই একটা বিপর্যয়কারী অবস্থায় থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

(চ) সুন্দরবনে ওপর থেকে জলবহনকারী কিছু মৃতপ্রায় স্রোতের পর্যাপ্ত জলসরবরাহ করার ক্ষমতার ব্যাপারে একটা ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো উচিত।

(ছ) ক্ষয়প্রবণ জায়গাগুলিতে জলের তলার টান ভাঙতে জলের তলায় কিছু কিছু বাধা তৈরি করা দরকার। এই বাধা তৈরি করতে পারলে একদিকে পলি জমা

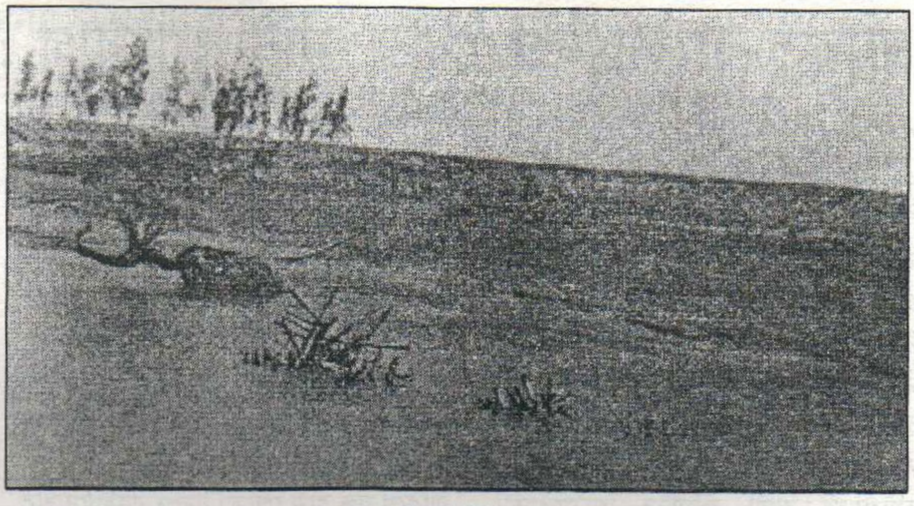

জোয়ার জলের অনবরত ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্থ নদীবাঁধ

হবে যেমন তেমনি ক্ষয়ও রোধ পাবে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা সেচ জলপথ বিভাগ করে থাকে পরকুপাইন খাঁচার সাহায্যে এবং তাতে ফলও ভালো পাওয়া গেছে।

(জ) বৃষ্টির জল ধরে রেখে মিষ্টি জলের জলাধার তৈরি করা দরকার এবং এগুলি করা যেতে পারে পলি জমে থাকা খাল ও গ্রামের পুকুরগুলির পলি কাটিয়ে। তাছাড়া অঞ্চলের জলবিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যবস্থার ভারসাম্য অটুট রেখেই সামান্য জোয়ার জলের যেসব নদী ও খাড়ি, সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে।

(ঝ) অঞ্চলে ইকো-ট্যুরিজম (পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন ভ্রমণ পরিকল্পনা)-এ উৎসাহ দেওয়া।

(ঞ) অঞ্চলটির অনন্য পরিবেশগত উৎকর্ষের কথা মাথায় রেখে ম্যানগ্রোভ অঞ্চল আরও বাড়িয়ে তোলা ও ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পে আরও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া।

(ট) অঞ্চলটির বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে দূরশিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঠ) যদিও ভূ-গর্ভস্থ জল এ অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩০০ থেকে ৪০০ মিটারের নীচে, তবুও যতটা সম্ভব টিউবওয়েল বসিয়ে মাটির তলা থেকেই পানীয় জলের ব্যবস্থা অন্তত কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি করে করা।

(ড) ভ্রাম্যমাণ ডিস্পেনসারির মাধ্যমে আরও উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

(ঢ) স্থানগুলির দুর্গমতার কথা বিবেচনা করে ও তাদের বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে বিভিন্ন জায়গায় ওয়ারলেস বিশ্বস্ততা (Wi-Fi) ব্যবস্থার মাধ্যমে উপ-গ্রহের সাহায্যে ইন্টারনেট সংযুক্তিকরণের সুযোগ করে দেওয়া।

(ণ) আরও বেশি করে সামাজিক বনসৃজন ও ম্যানগ্রোভ লাগানোর ব্যবস্থা করা।

(ত) অপ্রচলিত শক্তিকে আরও বেশি করে কাজে লাগিয়ে এসব অঞ্চলে বিদ্যুৎ শক্তির আরও বেশি প্রবর্তন ও জোয়ারের জল থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

(থ) রবি ফসলের মরশুমেও ওই চাষে চাষীদের আরও বেশি করে উৎসাহিত করা এবং আরও বেশিমাত্রায় কৃষিক্ষেত্রের সাহায্য দেওয়া।

(দ) বন্যা ও বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঝড়ঝঞ্ঝার মোকাবিলায় উপযুক্ত গণ-আশ্রয় শিবির তৈরি করা।

লেখক : মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী আয়োগ : একটি প্রতিবেদন

মে মাসের ২৬ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের মহানন্দা নদীতীরের গিলাবাড়ি, পোলাডাঙা ও আত্রেয়ী নদীপাড়ের মোহনপুর অঞ্চলের ভূমিক্ষয়ের জায়গাগুলি এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ইছামতী নদীর নিকাশি সমস্যা সরজমিনে পরিদর্শন করে আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর নদীসংক্রান্ত বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্থায়ী কমিটির আঠারোতম আলোচনাসভাটি গত ৩০/৩১ মে ২০০৫ কলকাতায় হয়ে গেল।

বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ভারত সরকারের জলসম্পদ মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চলীয় কমিশনার এম এল গোয়েল, সঙ্গে উপ-কমিশনার রবিশংকর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের দুই মুখ্য বাস্তুকার সাধন বিশ্বাস এবং অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয়। অন্য তরফে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের সদস্য তহিদুল আনোয়ার খান।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ ২৭ ও ২৮ মে ২০০৫ ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ জেলার বিপরীতে বাংলাদেশের, চাপাই-নবাবগঞ্জ জেলায় মহানন্দা নদীর আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর গিলাবাড়ি ও পোলাডাঙা এলাকা এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিনাজপুরের বিপরীতে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার আত্রেয়ী নদীর মোহনপুর অঞ্চলে নদীর ভূমিক্ষয়ের জায়গাগুলি পরিদর্শন করেন। উক্ত অঞ্চলগুলিতেতাদের পরিদর্শনের সময়ে বাংলাদেশের পক্ষে জানানো হয় যে, গত ২০০৪-২০০৫ আর্থিক বছরে মহানন্দা ও আত্রেয়ী নদীর উক্ত ভূমিক্ষয় এলাকাগুলির মূল্যবান সম্পদ ও জমি রক্ষার্থে বাংলাদেশের দিকে বাংলাদেশ জল উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে নদীতীরভূমি বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বাংলাদেশ জল উন্নয়ন বোর্ড যে সমস্ত নদীতীরভূমি রক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছে সেগুলি গিলাবাড়ি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স, মহানন্দা নদীর ডানপ্রান্তের জমিজমা ও আত্রেয়ী নদীর তীরভূমি মোহনপুরের ঘরবাড়ি বাঁচাবার জন্য ভীষণ জরুরি ছিল। কিন্তু ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর আপত্তির কারণে এ সমস্ত কাজ করা যায়নি এবং বর্তমানে তা যুগ্ম নদী আয়োগের কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশের দিকে আত্রেয়ী নদী সংলগ্ন মোহনপুর অঞ্চলের কাজও সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর (বি এস এফ) আপত্তির কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলা ও ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার শাসকবৃন্দের মধ্যে সমস্যা সমাধানে যে সমস্ত প্রস্তাবের চুক্তি হয়েছে সে চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলি বাংলাদেশ উল্লেখ করে। ১৮ ডিসেম্বর ২০০৪ সালের এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে, যৌথ জরিপ শেষ হলেই বাংলাদেশ পূর্ব মোহনপুরের রিভেটমেন্ট কাজগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করবে, যদিও কাজের ক্ষেত্রটি বাংলাদেশের দিকে এবং শূন্য লাইন বরাবরই ছিল।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা গিলাবাড়ির ভাঙন-কবলিত জায়গা পরিদর্শনের সময় লক্ষ করেছিলেন যে, নদীর ডানপ্রান্তে বাংলাদেশের দিকে সাম্প্রতিক কোনোরকম ভাঙনের চিহ্ন নেই। বরং ভারত ভূখণ্ডে নদীর ডানপ্রান্তিক উজানে কিছু ভাঙনজনিত অঞ্চল চোখে পড়েছিল। বাংলাদেশ অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে জোর দিয়ে জানায় যে, তাদের দিকেই ভয়ংকর ও গভীর ভাঙন লক্ষ করা গেছে। এ ব্যাপারে পোলাডাঙা অঞ্চলে, নদীর ডানপ্রান্তের তিন কিলোমিটার লম্বা অঞ্চলটি বাংলাদেশ "কংক্রিট ব্লক" দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অঞ্চলটি পরিদর্শনের সময় ভারতের প্রতিনিধিরা লক্ষ করেন যে, ভারত-ভূখণ্ডে নদীর বাঁদিকে ইতিমধ্যেই প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় প্রতিনিধিরা তাই আবার মনে করিয়ে দেন যে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের দিক থেকে কোনো রকম কাজ হাতে নেওয়া হলে সেই কাজের দরুন, প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ায় ভারত ভূখণ্ডে নদীর বাঁদিকে গভীর ভাঙন শুরু হয়ে যাবে। ওদিকে বাংলাদেশের মোহনপুরে আত্রেয়ী নদীপ্রান্তে স্পষ্টতই কিছু ভাঙনের চিহ্ন লক্ষ করা গেছে, যেগুলি আরও বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করার কথা বলেন ভারতীয় প্রতিনিধিরা। স্থায়ী কমিটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ইছামতী নদীর যৌথ সীমানা আঙরাইল ও কালাঞ্চি মধ্যবর্তী অঞ্চলটি গত ২৯ মে ২০০৫ পরিদর্শন করেন। ওই পরিদর্শনকালীন সফরে ভারতীয় প্রতিনিধিরা অভিযোগ করে দেখান যে, নদীর বিভিন্ন অংশে কীভাবে মাছ ধরার ব্যবস্থাপনা ও চরচাষের কারণে নদীতে পলি জমা হচ্ছে এবং সে কারণে সংলগ্ন অঞ্চলগুলি দীর্ঘস্থায়ীভাবে জলে ডুবে থাকছে যা কিনা ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের বন্যার অভিজ্ঞতাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভারতীয় প্রতিনিধিরা আরও অভিযোগ করেন যে, ভারতের দিক থেকে এসব অন্যায় জবরদখল সরাবার চেষ্টা হলেও বাংলাদেশের দিক থেকে এ ব্যাপারে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে এ বছর, অর্থাৎ ২০০৫ সালেই যৌথ সীমানার এসব অন্যায় জবরদখল সরাবার ব্যাপারে উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক বাংলাদেশের যশোর জেলার ডেপুটি কমিশনারকে দু-দুটো চিঠি লেখেন। বাংলাদেশের দিক থেকে স্থায়ী কমিটিকে জানানো হয় যে, যশোরের জেলা প্রশাসন তাদের দিকের ইছামতী নদীর বাধা অপসারণের ব্যাপারে এরই মধ্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। পাশাপাশি আবার তাদের প্রতিনিধিরা ভারতের দিক পরিদর্শনকালে এ ধরনের বাধার কথাও উল্লেখ করেন।

ইছামতী নদীর যে সমস্ত অঞ্চল দু-দেশের সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়েছে তার জরিপের কাজ যৌথভাবে তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য টাস্ক ফোর্সকে স্থায়ী কমিটি অনুরোধ করেছে। জরিপের কাজ শেষ করে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যকর পরিকল্পনার মাধ্যমেই আঙরাইল ও কালাঞ্চির মাঝে ২১.৫ কিলোমিটারের জায়গাটির পলি অপসারণের বিষয়টিকে দেখার জন্য যুগ্ম নদী আয়োগ স্থায়ী কমিটিকে পরামর্শ দিয়েছে।

সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে

দামোদর উপত্যকা প্রকল্প

(বার্ষিক আয় ব্যয় প্রতিবেদন ও কিছু তথ্য)

সমরেশ কুণ্ডু

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে দুই রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার) ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে 'দামোদর উপত্যকা বহুমুখী প্রকল্প' একটি নতুন মাত্রার সংযোজন। প্রায় বছর বন্যার প্রকোপে মানুষের দুর্দশাকারী দামোদর নদকে নিয়ন্ত্রণে আনার পরিকল্পনা অনেক পূর্ব থেকেই অনুভূত ও কিছু প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনা হলেও প্রকৃত পক্ষে ১৯৪৩-এ শস্য, ঘরবাড়ি, প্রাণনাশ ও পথঘাট, রেলপথ বিচ্ছিন্নকারী ভয়াবহ বন্যা তৎকালীন সরকারকে বাধ্য করেছিল মূলত বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও বিধ্বংসী জলরাশিকে উন্নয়নে ব্যবহারের লক্ষ্যে বহুমুখী প্রকল্প রচনার। আমেরিকান নদী বিশেষজ্ঞ ও বাস্তুকার মিঃ ডব্লিউ. এল. ভুরডুইন দামোদর-বরাকর উপত্যকায় আটটি বাঁধ (মাইথন, পাঞ্চেৎ, তিলাইয়া, কোনার, তেনুঘাট, বোকারো, বার্মো বলপাহাড়ী) ও খাল প্রণালী সমেত একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ৭.৬০ লক্ষ একর জমিতে সারাবছর জলসেচ (পেরিনিয়াল ইরিগেশন), মোট ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ ও বোকারোতে ১৫০ মেগা-ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদির সুপারিশ করেন ১৯৪৫ সালে অর্থাৎ স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে।

উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অংশীদার করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ দ্বারা গৃহীত আইনের মাধ্যমে (Act XIV of 1948) দামোদর উপত্যকা নিগম (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন—ডি. ভি. সি.) নামে একটি স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা সৃষ্টি করা হয়। উক্ত আইন (Act) অনুযায়ী সম্পূর্ণ ব্যয় সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ (Power) এই তিন মূল বিষয়ে বিভাজন করে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সেচে যে যতটা উপকৃত হবে সেই অনুপাতে, বন্যানিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ৭ (সাত) কোটি টাকা বাদে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে $\frac{1}{3}$ (এক তৃতীয়াংশ) করে তিন অংশীদারের উপর ব্যয় আরোপিত হবে বলে ঠিক হয়। আবার প্রতি বিষয়ের উপর লাভ/ক্ষতি সেই সেই বিষয়ের খাতে জমা/খরচ বর্তাবে ও লাভ/ক্ষতি অংশীদারদের উপর আরোপিত মূল ব্যয়ের অনুপাতে বিভাজিত হবে বলে ঠিক হয়।

উক্ত আইন অনুযায়ী অংশীদারদের উপর আরোপিত ব্যয়ভার অংশীদাররা দেয় অর্থ যেমন সরাসরি কর্পোরেশনকে বরাদ্দ করবে বলে স্থির থাকে তেমনি কোনো অংশীদারের দেয় অর্থে ঘাটতি থাকলে তা কর্পোরেশন ওই অংশীদারের খরচে ঋণ সংগ্রহ করবে বলেও সংস্থান থাকে।

কাজের সুবিধার জন্য সমস্ত পরিকল্পনাটি দুটি পর্যায়ে রূপায়িত হবে বলে ঠিক হয় এবং প্রথম পর্যায়ের চারটি বাঁধ (পাঞ্চেৎ, কোনার, মাইথন ও তিলাইয়া) এবং খাল প্রণালী সমেত ব্যারেজ (দূর্গাপুর) এর কাজ সম্পূর্ণ (প্রায়) হয় ১৯৫৯ সালে। (পরবর্তীকালে বিহার সরকার তেনুঘাট বাঁধ নিজে নির্মাণ করে।) সেই অবস্থায় বিহার সরকার তার রাজ্যে সেচের জন্য কোনো জলের প্রয়োজন নেই জানানোতে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের খাতে প্রায় সম্পূর্ণ (বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সাত কোটি টাকা বাদে) ও বিদ্যুৎ খাতে এক তৃতীয়াংশের ব্যয় পশ্চিমবঙ্গকেই বহন করতে হচ্ছে (সরাসরি ও রাজ্যের খরচে ঋণ)। উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধার লক্ষ্যে কর্পোরেশনের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য ডি. ভি. সি. পশ্চিমবঙ্গকে সেচ খাল প্রণালী সমেত ব্যারেজ হস্তান্তর করে ১৯৬৪ সালে।

তিন অংশীদার সরকার ১৯৬৮-৬৯ আর্থিক বছরের পর ডি. ভি. সি.-কে সরাসরি আর অর্থ বরাদ্দ করেনি যদিও সেচ খাল ও ব্যারেজের কাজে প্রতিনিধি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরাসরি অর্থ ব্যয় করে আসছে।

২০০২-০৩ আর্থিক বছরের শেষে (৩১.৩.০৩) ডি. ভি. সি'র হিসাব পরীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা যায় তিন অংশীদার সরকার কর্পোরেশনের কাজে সরাসরি মোট ২১৪.৭৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে (১৯৬৪-এর পর সেচ খাল ও ব্যারেজের কাজে পশ্চিমবঙ্গের ব্যয় বাদে), যেখানে ওই সময়ে কর্পোরেশনের খরচ হয়েছে মোট ৪,০২৭.২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যয়ের বৃহৎ অংশ (৪,০২৭.২০—২১৪.৭৩) = ৩,৮১২.৪৭ কোটি টাকার সংস্থান হয়েছে বাজার ঋণ, সরকারি ঋণ, আভ্যন্তরিন অর্থ সংস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে।

যদিও প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য—বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ, দুই কাজই পশ্চিমবঙ্গ সেচ ও জলপথ দপ্তরের দায়িত্বে পালিত হয়ে আসছে কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য

সরকারের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কর্পোরেশনের পরিচালন পরিষদে (বোর্ড) তিনজনই শক্তি-দপ্তর থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। সম্ভবত উক্ত কারণ, ১৯৬৮-৬৯-এর পরে অংশগ্রহণকারীদের সরাসরি কোনো মূলধন বিনিয়োগ না করা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচে আয়ের পরিবর্তে ঘাটতি, অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনেই কর্পোরেশনের আয়, কর্পোরেশনকে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ উৎপাদনেই বেশি বেশি ঝুঁকে পড়তে সাহায্য করেছে। তাই দেখা যায় পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার অনেক বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করেও আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা হয়ে চলেছে। অন্যদিকে পরিচালনায় গৃহীত অগ্রাধিকার—বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ একটা জায়গায় থমকে আছে বা কমে যাওয়ার মুখোমুখি হচ্ছে। ডি. ভি. সি.-এর পরিচালন পরিষদে—যেখানে প্রকল্পের কাজ, আয় ব্যয় সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করা যায়, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ শক্তি দপ্তরের সচিব প্রতিনিধিত্ব করছেন। কিন্তু প্রকল্পের আয়ব্যয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট বিধান সভায় উপস্থাপনার জন্য পাঠানো হয় সেচ দপ্তরের সচিবের কাছে, যার পরিচালন পরিষদে বক্তব্য রাখার কোনো সুযোগ নেই।

ডি. ভি. সি.-এর বার্ষিক আয়ব্যয় প্রতিবেদনে দেখা যায়, যেখানে প্রতিবছর বিদ্যুৎ খাতে আয় বেড়ে চলেছে সেখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচে ঘাটতি বেড়ে চলেছে। শুধুমাত্র সেচে জল দেওয়া বাবদ ২০০২-০৩ পর্যন্ত ডি. ভি. সি.-র পাওনা ৭২.১৭ কোটি টাকা (প্রতিবেদনে সাময়িক ভাবে ৫৫.৭৭ কোটি টাকা দেখানো আছে। কিন্তু তথ্যাদি নিয়ে ০৫.৫.০৪-এ আলোচনার পর ৭২.১৭ কোটি টাকা দাঁড়ায়)।

২০০২-০৩-এর প্রতিবেদনে দেখানো অংশীদারদের জন্য ধার্য কাজে ব্যয়, তাদের দ্বারা মূলধন বিনিয়োগ ও ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যয়

(কোটি টাকা)

	বন্যানিয়ন্ত্রণ		সেচ		বিদ্যুৎ		মোট		
	ব্যয়	বিনিয়োগ (সরাসরি)	ব্যয়	বিনিয়োগ	ব্যয়	বিনিয়োগ	ব্যয়	বিনিয়োগ	সরাসরি বিনিয়োগের বাইয়ে ব্যয়
কেন্দ্রীয় সরকার	৭.০০	৭.০০	—	—	১,২৮৭.১৫	৪৯.০৯	১,২৯৪.১৫	৫৬.০৯	১,২৩৮.০৬
পশ্চিমবঙ্গ সরকার	১৮.২৬	১২.৪৭	১৪০.২২	৪৩.৯৫	১,২৮৭.১৫	৫২.৮৫	১,৪৪৫.৬৩	১০৯.২৭	১,৩৩৬.৩৬
বিহার (ঝাড়খণ্ড)	—	—	০.২৭	০.২৭	১,২৮৭.১৫	৪৯.১০	১,২৮৭.৪২	৪৯.৩৭	১,২৩৮.০৫
মোট	২৫.২৬	১৯.৪৭	১৪০.৪৯	৪৪.২২	৩,৮৬১.৪৫	১৫১.০৪	৪,০২৭.২০	২১৪.৭৩	৩,৮১২.৪৭

বিঃ দ্রঃ উক্ত প্রতিবেদন সেচখাল সমেত ব্যারেজের কাজে ১৯৬৪-এর পর পশ্চিমবঙ্গের সরাসরি বিনিয়োগ ব্যাতিরেকে।

ডি. ভি. সি.-র বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের চিত্র

(মেগা ওয়াট)

	মূল প্রকল্পে স্থিরিকৃত	ইতিমধ্যে স্থাপিত	অনুমোদিত আরও প্রকল্প	মোট (২+৩)	উপরন্তু আরও স্থাপনের প্রস্তাব	মোট (৪+৫)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
জলবিদ্যুৎ	২০০	১৪৪	—	১৪৪	—	১৪৪.০
গ্যাসটারবাইন	—	৮২.৫	—	৮২.৫	—	৮২.৫
তাপবিদ্যুৎ	১৫০	২,২৩৫	৫,২১০	৭,৭৪৫	৩,০০০	১০,৭৪৫.০
মোট	৩৫০	২,৭৬১.৫	৫,২১০	৭,৯৭১.৫	৩,০০০	১০,৯৭১.৫

বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচ ও সেচ কর :

শিল্প ও নগরায়নের স্বার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি জরুরি। কিন্তু মানুষের বাঁচার জন্য প্রথমেই চাই খাদ্যশস্য ও পানীয় জল। ভারতের জলনীতিতেও সর্বোচ্চাধিকারে রাখা হয়েছে পানীয় জল, এরপর সেচ, তৃতীয় বিদ্যুৎ ও পরে অন্যান্য।

কিন্তু সর্বাগ্রে বন্যানিয়ন্ত্রণ ও সেচে

আগ্রহ বজায় রাখতে হলে ওই খাতগুলো কমপক্ষে ঘাটতি শূন্য করে আনা অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্যথায় এই দুই বিষয়ে অনাগ্রহের বার্তা বহন করবে, যা ভবিষ্যতে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হওয়া স্বাভাবিক। সেচে জলকরের হার অত্যন্ত কম উপরন্তু ব্যবহারকারীদের থেকে আরও কম সেচ কর সংগৃহীত হওয়া এই খাতে অর্থ জমা পড়ায় ঘাটতির একটি বড় কারণ। মনে রাখা প্রয়োজন বন্যানিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রায় সম্পূর্ণই পশ্চিমবঙ্গের হওয়াতে এ বিষয়ে আয় ও ঘাটতি পশ্চিমবঙ্গের উপরই বর্তায়, কারণ এই বিষয়গুলোতে জমাকৃত অর্থ পশ্চিমবঙ্গের অনুকূলেই। জমি সেচের ক্ষেত্রে সেচকর বর্তমানে একর প্রতি— আমনে ১৫ টাকা, রবিতে ২০ টাকা এবং বোরোতে ৫০ টাকা (প্রতি মরশুমে), যা চাষে উপকৃত হওয়ার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। যেমন :

সেচপ্রাপ্ত বোরো ধান চাষের ক্ষেত্রে :		
প্রতি একরে ধান উৎপাদন = ২০০০ কি.গ্রা. @ ৬.৫০ টা/কি.গ্রা. =		১৩,০০০.০০ টাকা
খড়ের জন্য আয় বাদে সার ইত্যাদি সমেত চাষে খরচ	(–)	৫,০০০.০০ টাকা
		৮,০০০.০০ টাকা
প্রতি একর থেকে মোটামুটি আয়—৮,০০০.০০ টাকা		

কোথাও কোথাও স্থানীয় জলাশয় থাকলেও যে কোনো উপায়েই হোক জমিতে সেচের জন্য জল দেওয়ার ব্যয় প্রতি একরে ৫০ টাকার বহু গুণ বেশি।

কিন্তু এমন জমিই বহুগুণ বেশি যেখানে সরকারি সেচ ব্যবস্থাপনায় জল না পেলে সেচ একেবারেই সম্ভব নয়। জমি চাষহীন, উৎপাদনহীন হয়ে থাকতো বা থাকবে। চাষে অন্যান্য খরচের তুলনায় সেচ কর অত্যন্তই নগণ্য। সেচ না হলে উৎপাদন তথা আয় থেকে বঞ্চনার ভয়াবহতা সকলেই বুঝতে পারেন।

বিষয়গুলো চাষীদের মধ্যে ভালোভাবে প্রচারিত হলে তারা নিজেদের বৃহৎ স্বার্থেই জলকর দিতে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু সমান আগ্রহের সঙ্গেই কর সংগ্রহকারীদের এগিয়ে যেতে হবে।

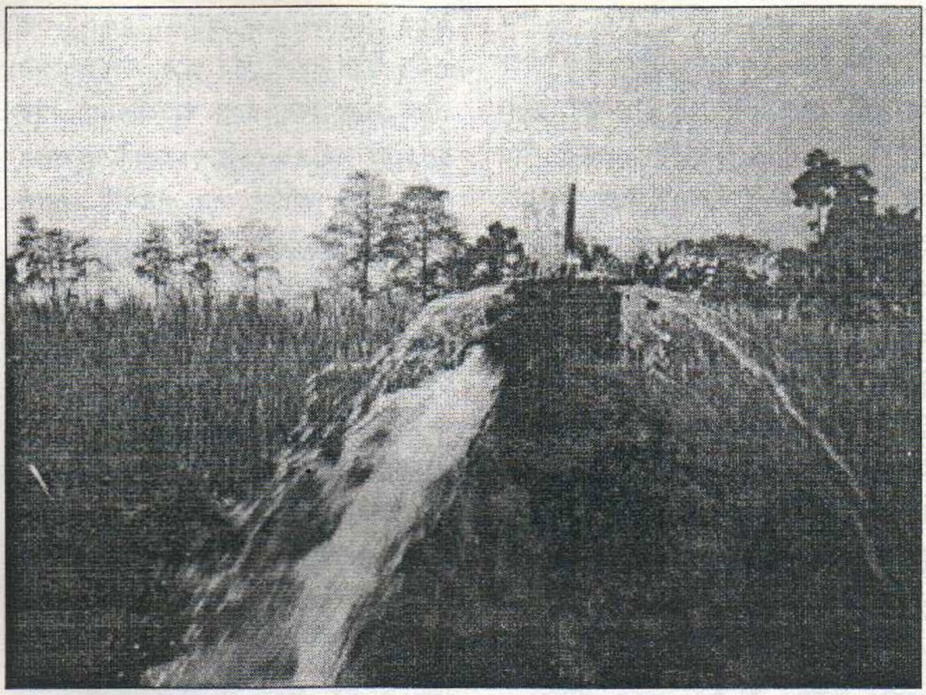

পাম্পসেটের সাহায্যে খেতে জলসেচ

সেচকর দেওয়ার প্রয়োজন নেই বলে কিছু বিভ্রান্তি কর প্রচার হতেই পারে। কিন্তু তা যে প্রারম্ভেই গাছের মূল কেটে 'পাতা, ফুল, ফল-এর সমৃদ্ধি'-স্বপ্নের মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর তা অতি সহজবোধ্য।

ডি. ভি. সি.-র হিসাব প্রতিবেদন

যৌথ উদ্যোগে ডি. ভি. সি.—তাই এর হিসেব প্রতিবেদন অংশীদারদের নজরে রাখা এবং বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো ডি. ভি. সি.-কে সরবরাহ করা অত্যন্ত জরুরি।

অংশীদারদের মূলধন বিনিয়োগ

গৃহীত নিয়মে অংশীদারদের উপর আরোপিত ব্যয় তারা যেমন সরাসরি বিনিয়োগ করবে তেমনি কোনো অংশীদারের দেয় অর্থে ঘাটতি তার খরচে কর্পোরেশনের ঋণ সংগ্রহের সংস্থান আছে। কিন্তু সরাসরি বিনিয়োগ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ১৯৬৮-৬৯ বা ২০০২-০৩ প্রতি বছরের প্রতিবেদনে কর্পোরেশনে অংশীদারদের মূলধন বিনিয়োগ যা দেখানো হয়ে আসছে—

১৯৬৮-৬৯-এর পর অন্য দুই অংশীদার কোনো মূলধন বিনিয়োগ না করলেও ১৯৬৪ সালের পর ব্যারেজ ও খালপ্রণালীর উন্নয়নের কাজে ডি. ভি. সি.-র প্রতিনিধি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মূলধন বিনিয়োগ করে আসছে। কিন্তু ডি. ভি. সি.-এর হিসাব রক্ষণ

(কোটি টাকা)

	বন্যানিয়ন্ত্রণ	সেচ	বিদ্যুৎ	মোট
কেন্দ্রীয় সরকার	৭.০০	—	৪৯.০৯	৫৬.০৯
পশ্চিমবঙ্গ	১২.৪৭	৪৩.৯৫	৫২.৮৫	১০৯.২৭
বিহার (ঝাড়খণ্ড)	—	০.২৭	৪৯.১০	৪৯.৩৭
মোট	১৯.৪৭	৪৪.২২	১৫১.০৪	২১৪.৭৩

বিভাগের মতে বিনিয়োগের যথাযথ পরিমাণ না পাওয়ায় ওই বিনিয়োগ অনির্দিষ্ট খাতে দেখানো হয়ে আসছিল। বিষয়টি ওই বিভাগের নজরে আনার পর ০৫.০৫.২০০৪ তারিখে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ২০০২-০৩ পর্যন্ত ওই বর্দ্ধিত বিনিয়োগ ৬৪.৭৮ কোটি টাকা নির্দিষ্ট হয় এবং তা মূলধন বিনিয়োগে যুক্ত হবে বলে স্থির হয় এবং ডি. ভি. সি.-এর পরবর্তী বার্ষিক হিসাব প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হবে বলেও স্থির হয়। উক্ত বিনিয়োগ মূলধনে যুক্ত হলে ২০০২-০৩-এ ডি. ভি. সি.-তে অংশীদারদের মূলধন বিনিয়োগ দাঁড়ায়.:

(কোটি টাকা)

	বন্যানিয়ন্ত্রণ	সেচ	বিদ্যুৎ	মোট
কেন্দ্রীয় সরকার	৭.০০	—	* ৪৯.০৯	* ৫৬.০৯
পশ্চিমবঙ্গ সরকার	১২.৪৭	৪৩.৯৫+৬৪.৭৮=১০৮.৭৩	* ৫২.৮৫	* ১৭৪.০৫
বিহার (ঝাড়খণ্ড)	—	০.২৭	* ৪৯.১০	* ৪৯.৩৭
মোট	১৯.৪৭	১০৯.০০	* ১৫১.০৪	* ২৭৯.৫১

(* বিঃ দ্রঃ)

আরও উল্লেখ্য, যেহেতু উক্ত ৬৪.৭৮ কোটি টাকা এতদিন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে মূলধন বিনিয়োগে দেখানো হচ্ছিল না ডি. ভি. সি.-র নিয়ম অনুযায়ী ওই মূলধনের উপর সুদ এবং সুদের উপর সুদও এতদিন ধরা হয়নি। ২০০২-০৩ পর্যন্ত উক্ত সুদ হিসেব করে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে যুক্ত হবে বলে আলোচনায় স্থির হয়। এই সুদ ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকারও বেশি। এই বর্দ্ধিত সুদ পরবর্তী বছরে প্রায় ৬ (ছয়) কোটি টাকা ও পরের পরে প্রতি বছর আরও বেশি।

পৌর ও শিল্পে ব্যবহৃত জলের মূল্য

ডি. ভি. সি.-এর নিয়ম অনুযায়ী দামোদর-বরাকর অববাহিকার জল উত্তোলনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে কিছু মূল্য দিতে হয়। যেহেতু অন্য কাজে জল ব্যবহারের কারণে সেচে জলপ্রাপ্তিতে ঘাটতি হয় ডি. ভি. সি.-এর নিয়ম ও মহামান্য বিচারকের রায় অনুযায়ী সংগৃহীত এই অর্থ 'সেচ' বিষয়ের অনুকূলে জমা হয়। সেচ বিষয়টি প্রায় পুরোপুরিই পশ্চিমবঙ্গের হওয়াতে এই অর্থ প্রায় পুরোপুরিই পশ্চিমবঙ্গের অনুকূলে আয়। কয়েক বছরের চেষ্টার পর উত্তোলনের মাধ্যমে ব্যবহার্য জলের প্রাপ্ত হিসাব থেকে দেখা যায় এই বিষয়ে জমাকৃত অর্থ যথাযথ নয়। বিশেষ করে ডি. ভি. সি.-এর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহৃত জলের ক্ষেত্রে অনেক কম মূল্য প্রতিবেদনে বা বাজেটে ধরা হয়ে আসছে। যেমন ২০০০-০১। ২০০১-০২ । ২০০২-০৩'-এ যেখানে এই মূল্য ৬.১৫৮ কোটি টাকা (প্রতি বছর) করে হওয়ার কথা সেখানে মাত্র ১.০০ কোটি টাকা করে ধরা হয়ে আসছে। ডি. ভি. সি.-র হিসাব রক্ষণ বিভাগের মতে যথাযথ তথ্য না পাওয়ার জন্যই তাদের বাজেট ও প্রতিবেদনে সাময়িক এমন মূল্য ধরতে হয়েছে। এই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে পত্রালাপ ও আলোচনার পর ০৫.৫.০৪'এ উভয় পক্ষের চূড়ান্ত আলোচনায় ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০০২-০৩ সাল পর্যন্ত এই খাতে আরও ৩৭.০৭ কোটি টাকা জমা হবে বলে স্থির হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে বিদ্যুৎ বিষয়ে ⅓ অংশ অংশীদারিত্বের জন্য ⅓ x ৩৭.০৭ কোটি টাকা ব্যয় পশ্চিমবঙ্গের উপরও বর্তায়। অন্য দিকে ২৭.০৭ কোটি টাকা জমা সেচ বিষয়ের অনুকূলে হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের অনুকূলে ২/৩ x ৩৭.০৭ = ২৪.৭১ কোটি টাকা আসবে।

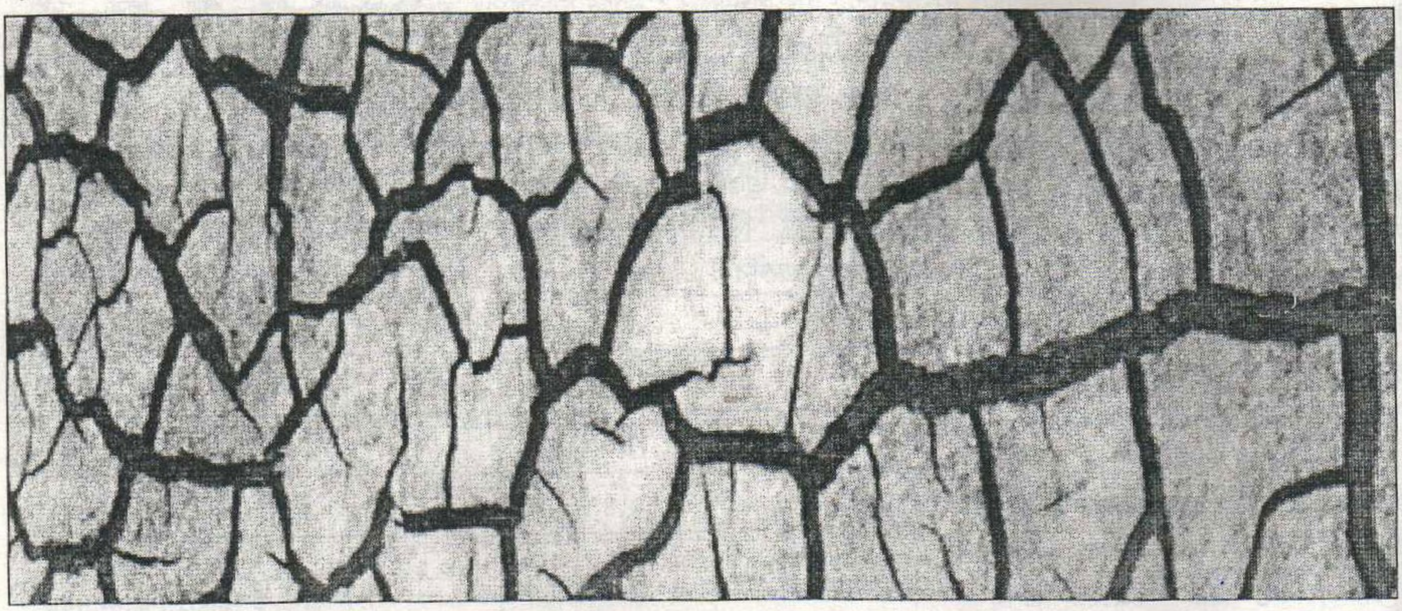

নিস্ফলা জমি

আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন শুধু ডি. ভি. সি.'র তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহৃত যে পরিমাণ জলের মূল্য ২০০২-০৩'এ ৬.১৫৮ কোটি টাকা, প্রতি হাজার গ্যালনের মূল্য ১.৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৫০ টাকা হওয়াতে ২০০৩-০৪ থেকে ওই পরিমাণ জলের মূল্য প্রতি বছরে ১০.২৬ কোটি টাকা এবং ইতোমধ্যে ডি. ভি. সি.-র আরও যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জল দেওয়া অনুমোদিত হয়ে আছে তা ক্রমান্বয়ে চালু হলে শুধুমাত্র ডি. ভি. সি.-এর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে জল ব্যবহারের মূল্য বছরে ২৭ কোটি টাকা দাঁড়াবে এবং এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের অনুকূলে বছরে $^2/_3$ x ২৭.০৭ = ১৮.০০ কোটি টাকা আসার কথা। কাজেই ডি. ভি. সি.-র তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সমেত অন্যান্য শিল্পে ও মিউনিসিপ্যালে ব্যবহৃত জলের তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ব্যারেজ ও খাল। উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত ব্যয়, উপযুক্ত সেচ কর আদায় ও জমা এবং ডি. ভি. সি.-র বাজেট ও বার্ষিক আয় ব্যয় প্রতিবেদনে তার অন্তর্ভুক্তি নজরে রাখা ঐকান্তিক ভাবে প্রয়োজন।

বিঃ দ্রঃ - অংশীদারদের ১৯৬৮-৬৯-এর পর সরাসরি প্রায় আর কোনও মূলধনই বিনিয়োগ না করা, অন্যদিকে পরিকল্পনার কাজে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎ খাতে প্রাপ্য লভ্যাংশ ডি. ভি. সি. অংশীদারদের প্রায় কোনো সময়েই প্রদান করতে পারেনি। এই অর্থ ডি. ভি. সি. অনির্দিষ্ট খাত, সংরক্ষিত খাত ইত্যাদিতে প্রদর্শন করে কাজে ব্যয় করে আসছিল। অন্যদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ খাতের ক্ষতি (কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-এর লভ্যাংশ থেকে বাদ দিয়ে), ঘাটতি হিসেবে দেখিয়ে আসছিল। জানা যায় ডি. ভি. সি.-র পরিচালন পরিষদে সাম্প্রতিক গৃহীত নীতি অনুযায়ী অংশীদারদের বিদ্যুৎ খাতের মূলধনের সঙ্গে এর লভ্যাংশ যুক্ত ও অন্য দুই খাতের ঘাটতি বাদ দিয়ে নতুন ভাবে হিসাব সংরক্ষিত হবে। এর ফলে বিদ্যুৎ খাতে অংশীদারদের মূলধন অনেক বেড়ে যাবে ঠিকই কিন্তু অন্য দুই অংশীদারের তুলনায় এই খাতে পশ্চিমবঙ্গের মূলধন কমে আসবে। কারণ বন্যানিয়ন্ত্রণ খাতে ঘাটতি ও সেচ খাতে প্রায় সম্পূর্ণ ঘাটতিই পশ্চিমবঙ্গের। যে বিষয়গুলো বিদ্যুৎ খাতে পশ্চিমবঙ্গের মূলধনে উক্ত ফারাক কমাতে সাহায্য করবে তা হল (১) সেচ খাতে বর্দ্ধিত ৬৪.৭৮ কোটি টাকা মূলধনের উপর বকেয়া সুদ (প্রায় ৪০.০০ কোটি টাকা) ছন্নগ্ন ডি. ভি. সি. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বকেয়া মূল্য ও বকেয়া সুদে (২৪.৭১ + ৮.০০ = প্রায় ৩৩.০০ কোটি টাকা) (২) পৌর ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত জলের বকেয়া মূল্য (প্রায় ১২.০০ কোটি টাকা) (৩) ডি. ভি. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বার্ষিক ব্যবহৃত জলের যথাযথ মূল্যের ২/৩ অংশ (৬.৮৪ থেকে ১৮.০০ কোটি টাকা প্রতি বছর) (৫) পৌর ও অন্যান্য শিল্পে বার্ষিক ব্যবহৃত জলের যথাযথ মূল্য (প্রায় ১৫.০০ কোটি টাকা—ক্রম বর্দ্ধমান প্রতি বছর) (৬) ১ থেকে ৫-এর অর্থ এবং ৬৪.৭৮ কোটি টাকা মূলধনে যুক্ত হওয়ার কারণে তার উপর সুদ (প্রায় ১০.০০ কোটি টাকা ক্রম বর্দ্ধমান/প্রতি বছর)। কিন্তু তৎসত্বেও সেচ খাতে যথাযথ সংগৃহীত হয়ে জমা না পড়ার ফলস্বরূপ বিদ্যুৎ খাতে মূলধন নিয়োগে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ পিছিয়ে পড়বে এবং তিন খাতে মোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে যাবে। তাই এই বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

লেখক : অধীক্ষক বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

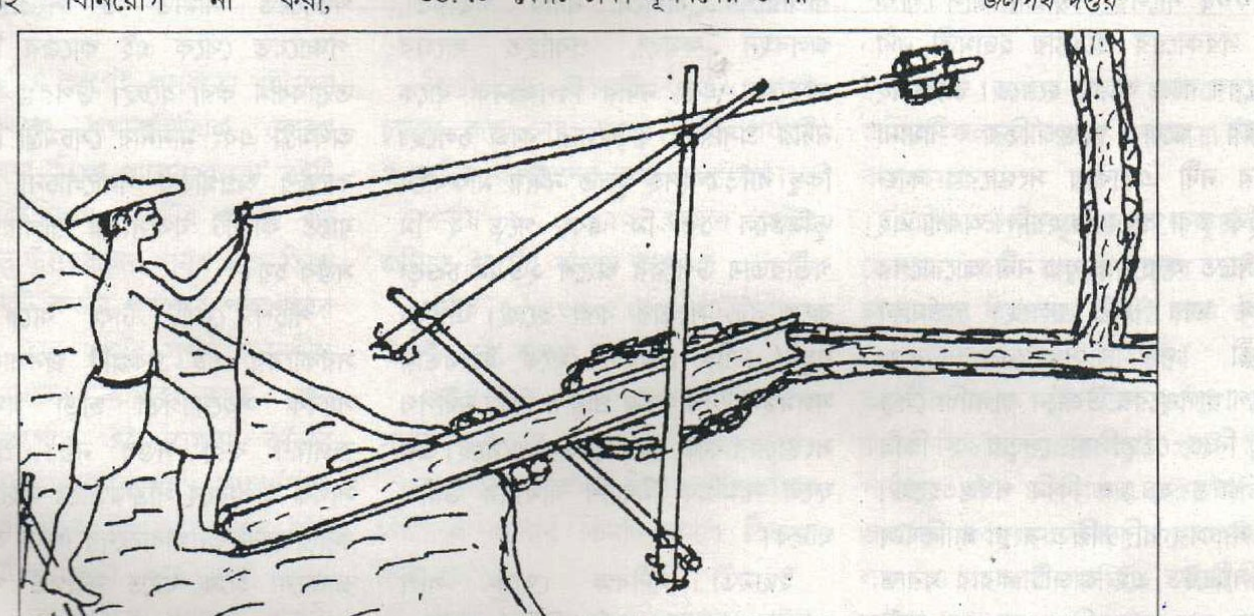

ছেচের জলে চাষ

উন্নয়ন

ইছামতী নদী সংস্কার : পরিকল্পনা ও রূপায়ণ

২০০০ সাল এবং ২০০৪ সালের বর্ষায় বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা, স্বরূপনগর ও বাদুরিয়া ব্লকে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে উত্তর ২৪-পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও বসিরহাট মহকুমার একাংশ প্রায় দুমাস জলমগ্ন ছিল। জলমগ্নতার কারণে ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্দশা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল। দীর্ঘকালীন জলমগ্নতার অন্যতম কারণ ছিল বনগাঁ মহকুমা আংড়াইল থেকে ভাটিতে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ইছামতী নদীবক্ষে পলি জমে থাকার দরুন নদীর জলপরিবহন ক্ষমতার ব্যাপক হ্রাস। অতিবৃষ্টিজনিত কারণে এই সমস্যার যাতে পুনরাবৃত্ত না হয়, সেজন্য রাজ্য সরকার জরুরিভিত্তিতে কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর মধ্যে ইছামতী নদী সংস্কার অন্যতম।

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় ইছামতী নদী সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়েছে। তবে এই প্রকল্পের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর নদী এলাকার সংস্কারের কাজ অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয়নি। অবশ্য এই কাজ যাতে করা যায় যুগ্ম নদী আয়োগের মাধ্যমে তার চেষ্টা চলছে। বর্তমানে ইছামতী নদী সংস্কারের কাজ বেড়িগোপালপুরের উজানে কালাঞ্চি সেতু থেকে নিচে তেঁতুলিয়া সেতুর ২ কিমি ভাটি পর্যন্ত ২৪.৯০ কিমি পর্যন্ত হচ্ছে। রাজ্য সরকার পরিচালিত সংস্থা ম্যাকিন্টস বার্ন লিমিটেড এই কাজটি করার বরাত পেয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য ২৫ কোটি টাকার মতো। এই কাজে যন্ত্রের সাহায্যে ইছামতী নদীবক্ষ থেকে পলি অপসারণ এবং নদীর পাড় থেকে দূরে যেরকম

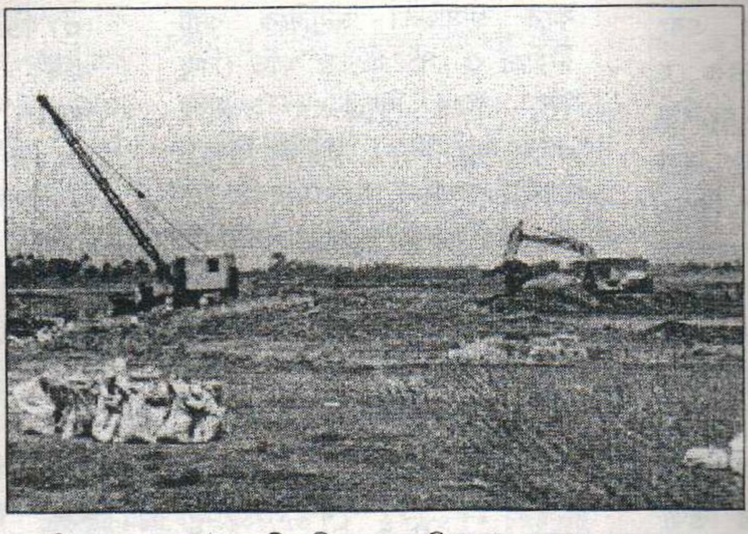

মেশিনের সাহায্যে ইছামতী নদী থেকে পলি অপসারণের কাজ চলছে

জায়গা পাওয়া যাবে, সেভাবে পলি সরিয়ে রাখা হবে। পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত রাস্তা বা বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে চাইলে বা ওই এলাকার লোকজনের নিজের প্রয়োজনে উত্তোলিত পলি বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এই প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে নদীর গভীরতা, জলবহন ক্ষমতা, প্রবাহিত জলের গতিবেগ এবং নদীর বিপজ্জনক বাঁকে নদীর প্রসারতা বাড়ানোর কাজ চলছে। কিছু ব্যতিক্রমসহ মূলত নদীর মাঝখানে ভূমিতলে ১৫ মি এবং গড়ে ২ মি গভীরতায় উপরের অংশে ২৩ মি চওড়া করে নদী সংস্কার করা হচ্ছে। এছাড়া যমুনা নদীর চারঘাট থেকে ইছামতীর সঙ্গমস্থল টিপি পর্যন্ত প্রায় ৯ কিমি নদীপথ সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সামগ্রিক নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে।

ইছামতী নদীবক্ষ থেকে পলি অপসারণের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাঙন-প্রবণ জায়গায় 'পরকুপাইন খাঁচা'র সাহায্যে নদী বাঁধ রক্ষা করা হচ্ছে। প্রতিটি খাঁচার মাপ ৭৫০ মিমি X ৭৫০ মিমি। উত্তর ২৪-পরগনা জেলার বন্যা মোকাবিলায় এই প্রকল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম এবং সমস্ত কাজটি ১২ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২০০৬ সালের বর্ষার আগেই শেষ করা হবে। বর্তমানে কালাঞ্চি, ঘোলা, দুর্গাপুর, টিপি, স্বরূপনগর ঘাট, রামচন্দ্রপুর ও তেঁতুলিয়াতে এর কাজ চলছে। রাজ্যে এই ধরনের কাজ এই প্রথম এবং আমাদের সারা দেশে এই ধরনের ব্যাপক ও দীর্ঘ নদী সংস্কারের কাজও প্রায় নজিরবিহীন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রকল্পটিতে অসীম গুরুত্ব আরোপ করেছে। কাজের তদারকি ও কাজে সহায়তার জন্য রাজ্য, জেলা, মহকুমা ও ব্লকস্তরে মনিটরিং কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটিগুলির সঙ্গে সঙ্গে জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এই কাজের নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে। উপরন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং মাননীয় সেচমন্ত্রী নিয়মিত কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করছেন যাতে কাজটি যথাসময়ে রূপায়ণ করা সম্ভব হয়।

পঁচিশ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পটি জনসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া যথাসময়ে রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। প্রকল্পটির সার্থক রূপায়ণে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে যাতে নদীগর্ভ পরিষ্কার থাকে। ভেচাল, কমোট, পাটা ইত্যাদি যেন নদীর গতিপথে বাধার সৃষ্টি না করে।

তিস্তা সেচ প্রকল্প : একবার ফিরে দেখা

বৈদ্যনাথ ঘোষ

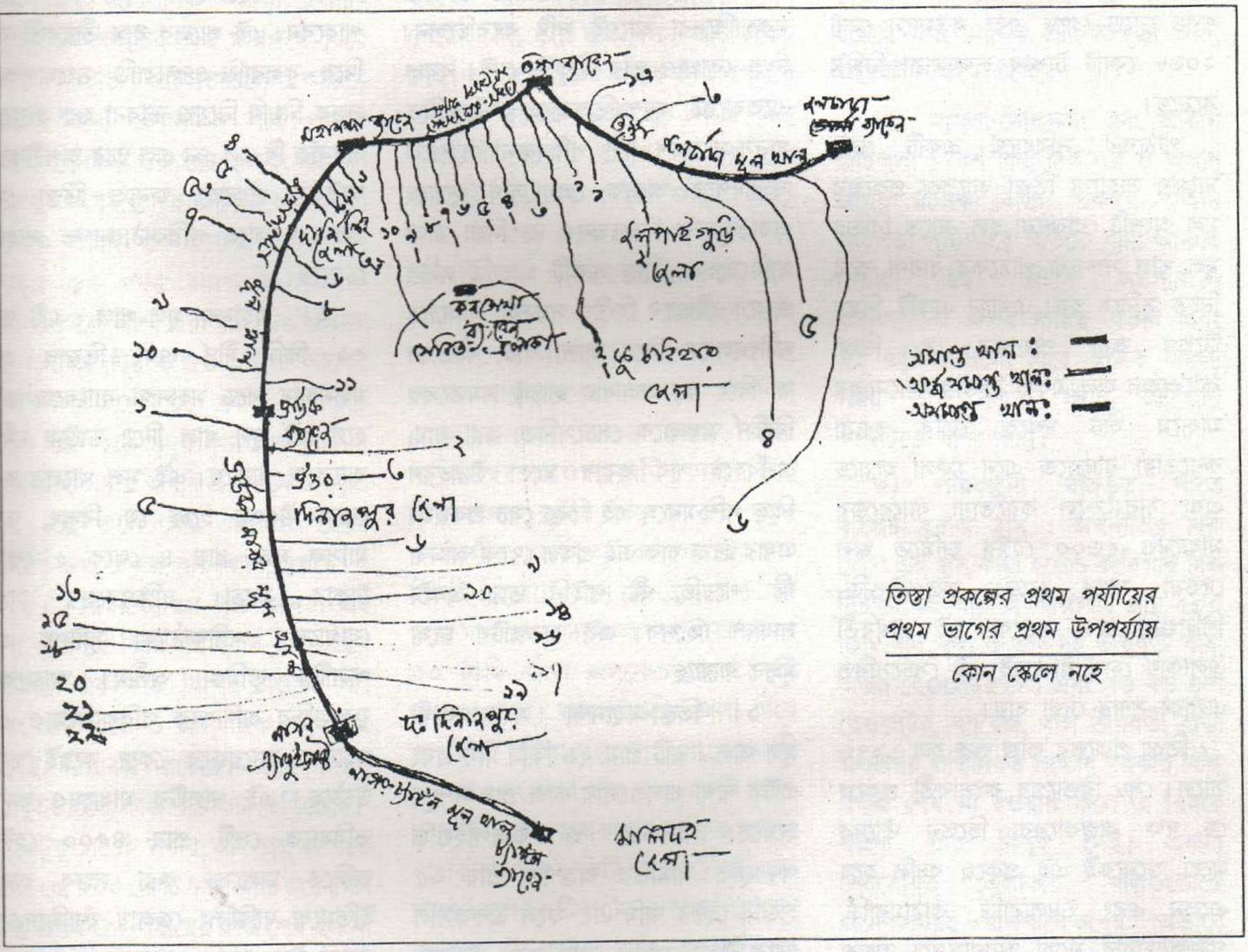

তিস্তা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের প্রথম ভাগের প্রথম উপপর্যায়

কোন স্কেলে নহে

কিছুদিন আগেই কলকাতা বইমেলা থেকে কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের লেখা 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' বইটি সংগ্রহ করেছিলাম। বইটির একটা বড় অংশ জুড়ে উত্তরবঙ্গের মানুষ এবং তিস্তা নদী এই দুটি কতটা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক তার একটা সুন্দর মননশীল বর্ণনা রয়েছে। আমার কাছে যেটা ভালো লেগেছে এই অমূল্য বর্ণনার মধ্যে তিস্তা ব্যারেজের সম্পূর্ণায়নে তিস্তার প্রাকৃতিক জীবনপর্ব শেষ হয়ে এক মানবিক নদী হয়ে ওঠা এবং সেকালের তিস্তাবুড়ির আবার কুমারী জীবনে ফিরে যাবারও একটা সুমধুর ইঙ্গিত রয়েছে।

তিস্তা সেচ প্রকল্পটি ১৯৭৬ সালে চূড়ান্ত রূপ নেয় এবং তিনটি পর্যায়ে প্রকল্পটির রূপায়ণের কথা ভাবা হয়।

পর্যায় ১ : ৯২২ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

পর্যায় ২ : ৬৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

পর্যায় ৩ : গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগ সাধন করে নৌ চলাচলের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পটির বিশালত্ব বিচার করে প্রথম পর্যায়কে আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয় :

প্রথম ভাগ—৫৪৬ হাজার হেক্টর জমি সেচ সেবিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়।

দ্বিতীয় ভাগ—২২৩ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়।

তৃতীয় ভাগ—তৃতীয় ভাগে কুচবিহার জেলায় ১৫৩ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়।

কর্মসম্পাদনার সুবিধার্থে প্রথম ভাগটির কাজ দুটি উপ-পর্যায়ে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম উপ-পর্যায়ে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচ এবং ২য় উপ-পর্যায়ে বাকি ২ লক্ষ ৪ হাজার জমিতে জলসেচের সংস্থান রাখা হয়।

পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭৫ সালের মে মাসে প্রকল্পটির উপরোক্ত প্রথম

উপ-পর্যায়ের কাজের ৬৯.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ের মঞ্জুরি প্রদান করে এবং এই উপ-পর্যায়ের কাজটি বর্তমানে চলছে। সময় দীর্ঘায়িত হবার ফলে প্রকল্পটির খরচ বেড়ে গেছে এবং বর্তমানে মোট ২০৬৮ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট রয়েছে।

পাঠকের সুবিধার্থে একটি ছোট্ট মাপের সাহায্যে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের মূল অংশটি বোঝানো হল, যাতে বিভিন্ন মূল খাল সম্পর্কে পাঠকের ধারণা করে নিতে সুবিধে হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিস্তা ব্যারেজের জল একটি ফিডার ক্যানেলের মাধ্যমে ষাট দশকে তৈরি হওয়া করতোয়া ব্যারেজে এনে ফেলা হয়েছে এবং যার ফলে করতোয়া ব্যারেজের মাধ্যমেও ৫৬০০ হেক্টর জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের দুই পার্শ্ববর্তী এলাকায় চোখ রাখলেই এই সেচসেবিত এলাকা সুন্দর দেখা যায়।

তিস্তা প্রকল্পের কাজ শুরু হল ১৯৭৬ সালে। সেচ বিভাগের কংসাবতী প্রকল্পে যে দক্ষ বাস্তুকারেরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই প্রকল্পে বদলি হয়ে এলেন এবং ওদলাবাড়ি, কাঠামবাড়ি, গাজলডোবার মতো অরণ্যসঙ্কুল অংশে বসবাস করে দিনরাতের বিশাল শ্রমে স্থানীয় ও বহিরগত শ্রমিকদের সাহায্যে গড়ে তুললেন সুবিশাল তিস্তা ব্যারেজ, মহানন্দা ব্যারেজ ও ডাউক ব্যারেজ। শুরু হল তিস্তা নদীর সঙ্গে মহানন্দা, তিস্তার সঙ্গে জলঢাকা এবং মহানন্দা-ডাউক সংযোগকারী মূল খালগুলির নির্মাণপর্ব।

হয়তো এও সত্যি যে, এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞটিকে সঠিকভাবে উত্তরবঙ্গের জনমানসে প্রতিফলিত করতে না পারা এবং এই প্রকল্পে যে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছিল ও এই প্রকল্পটির কতগুলি মহামূল্যবান দিক সম্পর্কে স্থানীয় মানুষ, বিভিন্ন জেলার জনপ্রতিনিধিদের ও সংবাদমাধ্যমকে সঠিকভাবে অবহিত করতে না পারা। আজ সমগ্র ভারতে নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প নিয়ে যে প্রস্তুতি ও বিতর্ক শুরু হয়েছে তার একটি ক্ষুদ্র রূপরেখা কিন্তু এই তিস্তা সেচ প্রকল্পের নকশাবিদেরা আগেই সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু কোথাও তার স্বীকৃতি নেই। বরঞ্চ একেবারেই সাম্প্রতিককালে পরিকল্পিত মানস-সংকোশ নদী পরিকল্পনা সম্পর্কে সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি হয়েছে এবং অনেক বিদগ্ধজনও তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু একটি পাহাড়ি নদীর জলকে কীভাবে বিস্তীর্ণ সমতল অঞ্চলের নদীগুলোতে নিয়ে আসা যায়, কীভাবে তা দিয়ে বড় জলাধার ছাড়াই সমতলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে সেচসেবিত করা যায়, এ-বিষয়ে গর্ব করার মতো উদাহরণ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই তিস্তা সেচ প্রকল্পই। এবার দেখা যাক এই প্রকল্প থেকে আমরা কী পেয়েছি, কী পাইনি তার একটা সাধারণ হিসেব। এই প্রকল্পটির মধ্যে মূলত রয়েছে :

১। **তিস্তা-মহানন্দা সংযোগকারী মূল খাল** : এটি প্রায় ২৬ কিমি দীর্ঘ এবং এটির শাখা খালগুলোর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। রাজগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত প্রায় ২৫ হাজার হেক্টর জমি এর ফলে একফসলি থেকে তিন ফসলি জমি হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ ভাগে ভাগে প্রায় ৭৫ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচ করার পরিকাঠামো সৃষ্টি হয়েছে। তিস্তার জল মহানন্দার বুকে ধরে এনে জনস্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি কর্পোরেশন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এস জে ডি এ টারমিনাস এবং ঘোষপুকুর বাইপাস এই খালের সময় তৈরি বাঁধের ওপর ধরেই শিলিগুড়ি-কলকাতার দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে তৈরি হয়েছে বেশ কটি বৃহৎ আবাসিক পরিকাঠামো, একটি তিনবাত্তি অঞ্চলে ও অপরগুলো রায়গঞ্জ, ইসলামপুর, ওদলাবাড়ি, ফুলবাড়ি ইত্যাদি জায়গায়। যারা সত্তর দশকের তিনবাত্তি অঞ্চল দেখেছেন তারা তিস্তা সেচ প্রকল্পের তিস্তা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন এলাকাটি দেখলেই পরিকাঠামো উন্নয়নে এই প্রকল্পের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। এই খালের বাম তীরবর্তী বাঁধ দিয়ে ফুলবাড়ি-ওদলাবাড়ি সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ নিয়েও ভাবনা শুরু হয়েছে। এমনকি বি এস এন এল তার অপটিক্যাল ফাইবার প্রকল্পের জন্যও তিস্তা সেচ প্রকল্পের কাছে পরিকাঠামোগত সাহায্য চেয়েছে।

২। **মহানন্দা মূল খাল** : এটি প্রায় ৩২ কিমি দীর্ঘ এবং তিস্তার জল মহানন্দায় পড়ে মহানন্দা ব্যারেজে জমা হয়ে এই মূল খাল দিয়ে ডাউক নদীর ব্যারেজে পড়েছে। এই মূল খালের জল থেকে উৎপন্ন হচ্ছে যে বিদ্যুৎ, তার মাসিক মূল্য প্রায় ৪ থেকে ৫ কোটি টাকার মতো। দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ পরিকাঠামো সৃষ্টিতে এই খালটির ভূমিকা অসীম। আজকের ফুলবাড়ির বাণিজ্যিক পরিকাঠামোও এই মহানন্দা ব্যারেজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এই খালটির মাধ্যমেও অদূর ভবিষ্যতে সেটি প্রায় ৪৫০০ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে দার্জিলিং জেলায় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের উল্লেখযোগ্য এলাকায় সেচের জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

৩। **ডাউক-নাগর মূল খাল** : পরিকল্পনা রূপায়ণের শুরু থেকেই এই খালটির নির্মাণকার্যে বেশ বাধা এসেছিল এবং কিছু বাঁধা এখনও আছে। এর মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কবরখানা এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমাধিস্থল নিয়ে জমি অধিগ্রহণে প্রচুর সময়ের অপচয় হয়েছে। তবে এখনই এই খালটির মূল দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ কিমি হলেও তার মধ্যে ৬৫ কিমি অংশের ওপর বিশেষ নজর রেখে এটি দ্রুত সমাপ্ত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় ২০০৮ সালের মধ্যেই এই খাল থেকে ৩৩,৫০০ জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হবে।

৪। **তিস্তা-জলঢাকা মূল খাল** : র্তমানে খালটির প্রায় ৩০ কিমি অবধি াজ চলছে। মাঝে আইনগত জটিলতা াবং কিছু প্রশাসনিক সমস্যা ইত্যাদি ারণে এই খালটির কাজ মাঝপথে থেমে ায়। সম্প্রতি জটিলতাগুলো কাটিয়ে ঠবার জন্য প্রশাসনিক শীর্ষ পর্যায়ে দক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে এবং এই মূল ালের অসমাপ্ত কাজগুলোকে সমাপ্ত রবার প্রয়াস শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে ণমূল স্তর পর্যন্ত জনগণের সহায়তা াওয়া গেলে আশা করা যায় শাখাখালসহ ই মূল খালটির কাজও ২০০৮ সালের ধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। ক্রান্তি, মানাবাড়ি থকে শুরু করে সুদূর কুচবিহার জেলার ামালদহ অঞ্চল অবধি এর ফলে উপকৃত বে। এই খালে মোট ৩৮,০০০ হেক্টর মিতে জল দেবার পরিকল্পনা রয়েছে।

৫। **নাগর-ট্যাঙন মূল খাল** : এই াল প্রায় ৪৫ কিমি দীর্ঘ হবার কথা। তবে র্তমানে এর কাজ বিশেষ এগুচ্ছে না। বং এটি সার্ভে ও আনুষঙ্গিক অনুসন্ধান র্বেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তবে নাগর ্যাকুইডাক্টের কাজ অনেকটা এগিয়েছে।

এটুকু পড়েই সবার মনে প্রশ্ন জাগতে ারে যে, ৯০০ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেল ন্তু প্রথম উপ-পর্যায়ের কাজ শেষ হল না ন? প্রথমেই একটি বিষয় মাথায় রাখা ালো যে তিস্তার ব্যয় সম্পর্কে জনমানসে ম্ভবত ধারণা নেই যে, এই ব্যয়ের মধ্যেই স্তা প্রকল্পের সরকারি কর্মচারীদের প্রায় ৮ বছরের বেতন, ভ্রমণভাতা, ওয়ার্কচার্জ র্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড / বেতন / মণভাতা / অবসরের সময় এককালীন দেয় অর্থ, যাতায়াত পরিকাঠামো, ধিগ্রহণের খরচ প্রায় সবই ধরা আছে। র্থাৎ এই অর্থ কেবল কাজেই ব্যবহৃত ানি। এবার আসি কী কী কারণে প্রকল্পটি র্বায়িত হল :

ক) **জমি অধিগ্রহণের সমস্যা** : যে ানো প্রকল্পেই জমি অধিগ্রহণ একটি রাট সমস্যা এবং তিস্তার বিশালত্ব চারে এর জটিল দিকটি সহজেই অনুধাবন করা যায়। একটি জমি ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর অধিগ্রহণ করেছিল কিন্তু তারপরেই সেখানে কাজ শুরু করা যায়নি। হয়তো জমির ক্ষতিপূরণ প্রাপক মারা গেছেন কিন্তু তার সাকশেসন সার্টিফিকেট নেই। এক বর্গাদারের বদলে অন্য বর্গাদার নথিভুক্ত হয়েছে এবং এর সঙ্গে কিছু স্বার্থান্বেষী চক্রের বাধার ব্যাপার তো রয়েছেই। নিজের বাড়ির জন্য একটু জমি কিনতে গেলে আমরা বুঝি যে বিষয়টিতে কী পরিমাণে ঝামেলা পোহাতে হয়। সেখানে এতবড় প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের নিজেদের কোনো সেল না রেখে বাস্তুকারদের মাথায়ই সবকিছু বোঝা চাপানো সম্ভবত কাজে সমস্যা বাড়িয়েছে। তারওপর জমি বেদখল, কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় কিছু ব্যক্তির চতুর কার্যাবলীর জন্য অনেক ক্ষেত্রেই কার্য বিলম্বিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে খালের মধ্যে মাত্র এক কাঠা দখল না পাওয়া জমিও ২০ কিমি খালে জলসেচে বিলম্ব সৃষ্টি করতে পারে। জলপাইগুড়ি জেলা দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা-মহানন্দা সংযোগকারী খালের ২নং শাখা খাল তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মাত্র জনাকয়েক ব্যক্তির আইনি বাধার কারণে ৩৮ কিমি খালের নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ হলেও ৭টি প্লটের ওপর স্থগিতাদেশ থাকায় সেই সামান্য বাকি কাজটুকু শেষ করতে অমূল্য ২৫টি বছর পেরিয়ে গেছে।

খ) **রেল ও সড়ক ক্রশিং-এ সময় নেওয়া** : একটি রেল এবং জাতীয় সড়ক সেতু তৈরিতে প্রচুর সময় নেয়। পরিবহন সচল রেখেই এই কাজগুলি করতে হয়। আর তিন চারটে মন্ত্রক একসঙ্গে হয়ে তাদের মিলিত প্রচেষ্টায় এই সমস্যাগুলো সমাধান করেন। তিস্তা প্রকল্পে অসংখ্য রেল ও সড়কসেতু তৈরি হয়েছে।

গ) **অর্থ সংস্থানে অপ্রতুলতা** : কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পে প্রথম পনের বছর প্রায় কিছুই বরাদ্দ করেনি। ৯৫-৯৬ সাল থেকে সেন্ট্রাল লোন অ্যাসিস্ট্যান্স বা কেন্দ্রীয় ঋণ অনুদান খাতে টাকা আসতে শুরু করে এবং কাজ কিছুটা ত্বরান্বিত হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর অর্থের বরাদ্দ না থাকলে বাস্তুকারদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। ২০০৪ সালের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং আর্থিক প্রতিবন্ধকতা এখন অনেকটাই কমে এসেছে।

ঘ) **মামলা-মোকদ্দমা এবং আইনি জটিলতা** : বেশ কিছু ঠিকাদার ও অসাধু জমির মালিক বিভিন্ন প্রকারে আইনি জটিলতা সৃষ্টি করে গতিতে বাধা আনতে সচেষ্ট। এই আইনি সমস্যাগুলি বাস্তুকারদের ওপর দায়িত্ব বর্তায় এবং এই জটিলতাগুলো নিয়ে অনেক অমূল্য সময় ব্যয় করার ফলে কারিগরি কাজটিতে বাধা পড়ে।

ঙ) **পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে বাজেট বরাদ্দ হ্রাস** : অর্থনীতির দিক থেকে এই হ্রাস কাম্য হলেও কারিগরি দিক বিচারে এই ব্যয় অবশ্যম্ভাবী। প্রায় ৫০০ কিমি দীর্ঘ খাল ও তার দুই তীরবর্তী বাঁধ, অজস্র রেগুলেটর গেট এবং বড় বড় ক্রশ রেগুলেটর, ব্যারেজ, খাল তীরবর্তী রাস্তা এগুলোর প্রতিনিয়ত সংস্কার দরকার কিন্তু প্রকল্প শেষ না হওয়ার ফলে এ বিষয়ে বরাদ্দ প্রায় কিছুই নেই। এজন্য সেচসেবিত এলাকার খালগুলোকে অনেকসময়ই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ত্রুটি থেকে যায় এবং খালগুলোর শেষ প্রান্তে জল পৌঁছায় না। ফলে জনমানসে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে ও প্রকল্প আধিকারিকেদের এর ফলে আইনশৃঙ্খলার সমস্যাও পড়তে হয়। এমনকি বহু সময় আধিকারিকরা ভ্রমণভাতা না পেয়েও বছরের পর বছর কাজ করতে বাধ্য হন। এর জন্য অনেক আধিকারিককে বছরের শেষ দিকে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হয়। সহকারি বাস্তুকার এমনকি নির্বাহী বাস্তুকারদের বেশ কিছু পদ খালি পড়ে আছে। সাধারণ করণিক, জরিপকারী এসব পদেও আরও কর্মচারী দরকার।

চ) **ভূমি অধিগ্রহণে অ্যাক্ট-২-এর বিলোপসাধন** : এটিও জমি অধিগ্রহণে কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এটির অবশ্য কিছু

ভালো ও মানবিক দিকও রয়েছে। তবুও অনেকক্ষেত্রে দ্রুত অধিগ্রহণের দরকার থাকলেও অ্যাক্ট-২এর বিলোপ হওয়াতে জমি রিকুইজিশন করা যাচ্ছে না।

ছ) **পরিবেশ রক্ষাজনিত অনুমতি আদায়ে বিলম্ব** : দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্প আধিকারিকদের চেষ্টা সত্ত্বেও পরিবেশ মন্ত্রকের অনুমতি পাওয়া যায় ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং এর জন্য তিস্তা-জলঢাকা নির্মাণকার্যের প্রয়াস অনেকাংশেই বিলম্বিত হয়।

জ) **অন্যান্য বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা** : অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি নীতি-নির্দেশ সর্বাংশে মেনে দ্রুত কাজ করা সম্ভব হয় না। টেন্ডার প্রক্রিয়ার জটিলতা, দরপত্র গ্রহণে নানারকম বিধিনিষেধ, সহকারি বাস্তুকার পর্যায়ে বাস্তবিকে কোনো ক্ষমতাই না থাকা এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত পর্যায়ের সঙ্গে আধিকারিকদের যোগসূত্রের অভাব, দ্রুত কার্য সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করেছে। যে কোনো কারণেই হোক অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা কিছু প্রয়োজনীয় কিন্তু অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে প্রকল্প আধিকারিকদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেন না। এর ফলে প্রকল্পে কর্মরত ঠিকাদার ও অবর-সহ বাস্তুকারেরা বহু সময়েই কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

ঝ) **সেচ খালের সংস্কারজনিত সমস্যা** : দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গের মাটিতে বালির পরিমাণ অনেক বেশি থাকায় মাটির দানাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন অর্থাৎ কারিগরি ভাষায় কোহেশন অনেক কম। এর ফলে পাইলিং করা থাকলেও অনেক সময় ধস নেমে বড় খালগুলোতে দুর্ঘটনা ঘটে। ১৯৯৯, ২০০৫-এ মহানন্দা মূল খালের জমির অনেক ওপর দিয়ে বয়ে চলা অংশে ভাঙন ও তদ্‌জনিত কারণে সংলগ্ন গ্রামগুলির ক্ষতি জটিলতা বাড়ায়। জলসরবরাহ হঠাৎ বন্ধ করা ও না করার পারস্পরিক টানপোড়েনের মধ্যে বাস্তুকারদের পড়তে হয়। মেরামতি কাজও সরকারি নানা আইন মেনে এবং অনুমোদন সাপেক্ষে করতে হয়। এতে সময় নেয় ও এর ফলে মেরামতিতে বিলম্ব হবার জন্য জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ সবসময় না থাকায় এ রকম অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতে বাস্তুকারদের পড়তে হয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি এর ফলে সেচের জল/বিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হয়। নিকটস্থ বাস্তুকারদের এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিগুলো সামলাতে বেশ খানিকটা সময় দিতে হয়। মূল প্রকল্পের কাজ এর ফলে সেই অংশে আরও খানিকটা বিলম্বিত হয়। স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়িয়ে এই সমস্যা মেটানো সম্ভব।

ঞ) **তিস্তা জলাধারের সমস্যা** : তিস্তায় উঁচু বাঁধ তৈরি না হলে পর্যাপ্ত জলের জলাধার তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জাতীয় তাপবিদ্যুৎ নিগমের অধীনে তিস্তার ওপর ছোটো ছোটো উচ্চতার বাঁধ তৈরি হলে প্রয়োজনমাফিক জলের বরাদ্দ বোরো মরশুমে নাও হতে পারে। এটি নিয়ে উঁচু পর্যায়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। বাংলাদেশের সঙ্গেও জলবন্টনের বিষয় জড়িয়ে আছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি আবশ্যিক বিষয়, যাতে তিস্তা, মহানন্দা, ডাউকের দুপারের বিস্তীর্ণ জমির চাষী যেন সেচের জল থেকে কোনোভাবেই বঞ্চিত না হয়।

তিস্তা সেচ প্রকল্পের সমালোচনা প্রসঙ্গে অনেক বিদগ্ধ বাস্তুকারকেও বলতে শুনেছি যে এতে এত শতশত কোটি টাকা খরচ না করে গভীর বা অগভীর নলকূপের মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা করা যেত। এবং তাতে খরচ অনেক কম হত। এখানে বলা যেতে পারে যে এই পরিমাণ জমি সেচসেবিত করতে কত ডিপ-টিউবওয়েল বসানো দরকার তার হিসেব কি তাঁরা করেছেন? আর মাটির নিচের জল টেনে নিলে তার পরবর্তী অবস্থা কী দাঁড়াবে ! সব নিয়ে তাঁদের স্মরণ করাই যে, উত্তরবঙ্গের মালদা ও দক্ষিণবঙ্গের কথা মাথায় রাখুন। ভূগর্ভস্থ জল সেচের কাজে লাগালে তার পরিণাম যে কী হতে পারে আর্সেনিক রোগাক্রান্ত মানুষগুলোকে দেখলে তা বোঝা যায়। পলি জলে সেচখাল জমির যে উর্বরতা বাড়ায়, ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে বেশ কিছু পরিমাণে রি-চার্জ করতে পারে এবং পেয় মিষ্টি জলের জোগান দিতে পারে। প্রাপ্তির এই বিরাট হিসাবের কাছে খরচটা কিন্তু অনেক কম বলেই মনে হবে ও এই প্রাপ্তি এক দীর্ঘকালব্যাপী প্রসারিত থাকবে।

যাই হোক, কেবল সমালোচনা আর সমস্যার উল্লেখ নয় কিছু সদর্থক প্রয়াস নিয়েও চলতে হবে। বৃষ্টি শেষ হলে আকাশ যেমন পরিস্কার হয়, সপ্তবর্ণে রঞ্জিত রামধনু যেমন আকাশে প্রতিভাত হয়, তেমনি এই নদীবন্ধন, এই ব্যারেজ, এই খাল / শাখাখাল দেশের অর্থনীতি বদলে দেবে, উৎপাদন বাড়বে—আমরা বাস্তুকারেরা যেন এ কথাটা বলতে পারি, 'আমি তোমাদেরই লোক, এই হোক মোর পরিচয়'।

লেখক : নিবাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

সেচপত্র নিজে পড়ুন অন্যকে পড়ান

আপনার মতামত জানান

জলসম্পদ ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালনের নিরিখে বিশ্ব, ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ

অঞ্জন দাশগুপ্ত

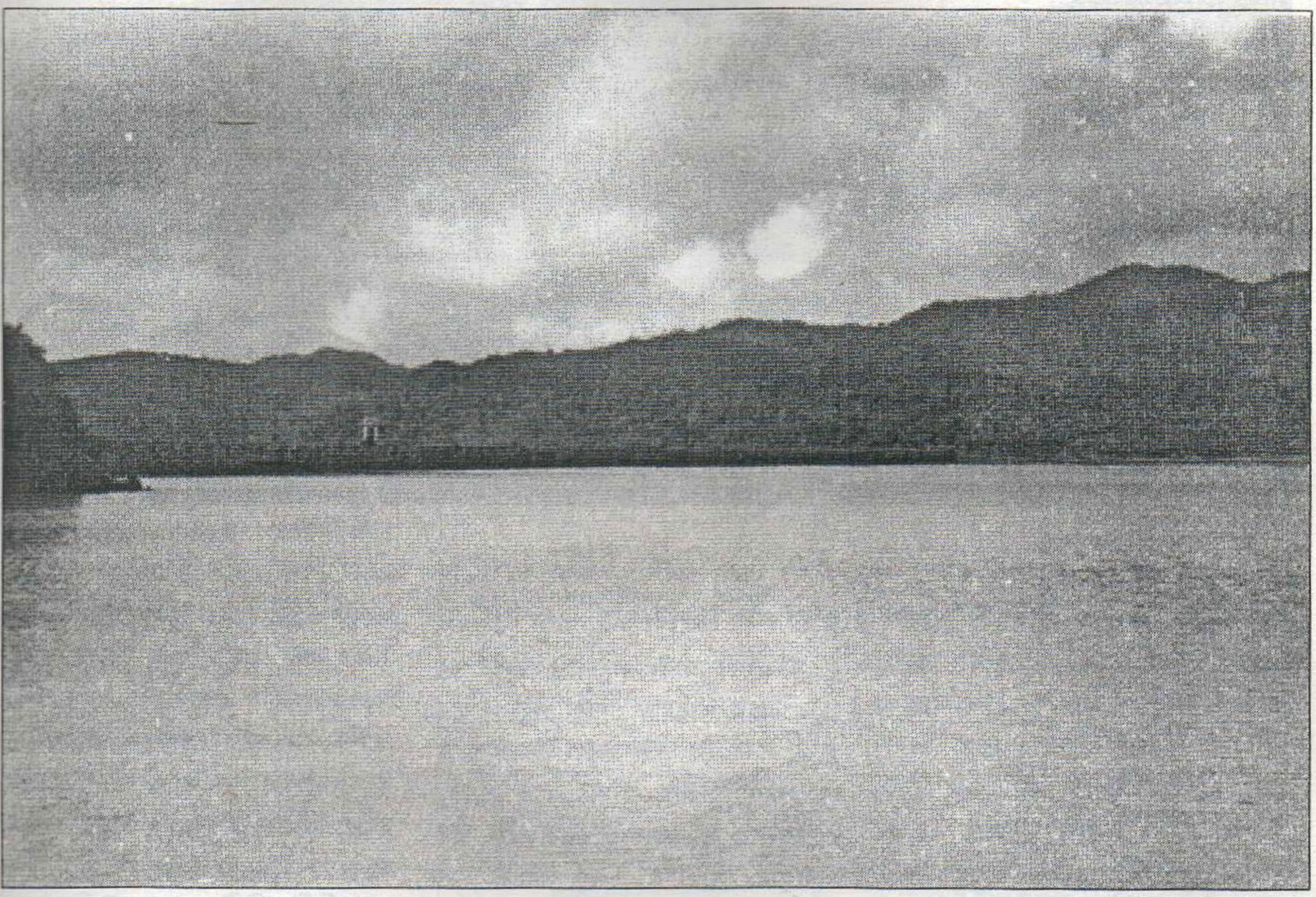

জলাধারের মাধ্যমে নদীর জল সংরক্ষণ

ভূমিকা

জল সমস্ত মানব ও জীবজগতে অপরিহার্য। পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমের অন্যতম জল। নিঃশ্বাস নেবার জন্য যেমন বায়ু তেমনি একইভাবে জীবনধারণে জল ছাড়া ভাবা যায় না। তাই জলই জীবন। পৃথিবীর বয়স ৪৬০ কোটি বছর হয়ে গেল। অতীতে ভাগ্যক্রমে আবহমণ্ডলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছিল জল। শুরু হল জীবজগৎ। এর পরে সমুদ্র সৃষ্টি হল। তারপর প্রায় ১৬ কোটি বছর আগে ক্রিটেশিয়াস যুগে সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি পেতে লাগল।

জল তাই মানুষের কাছে এক পরম আশীর্বাদ। সভ্যতার আদিম প্রভাত থেকেই মানুষ তার বিভিন্ন কাজে জলের ব্যবহার করে আসছে পৃথিবীর সর্বত্র। নিশ্চিত জলের জোগানের জন্য মানুষ প্রথম থেকেই নদী সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। গড়ে উঠতে থাকে নদীভিত্তিক সভ্যতা। চাষের জন্য সেচের এবং গৃহস্থালির প্রয়োজন ছাড়াও নৌপরিবহনে নদীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তবে বন্যার আশংকা ছিল প্রভূত। নদীর ধারে গড়ে ওঠা কত উন্নত সভ্যতা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেছে। নদী তীরবর্তী অঞ্চল ছাড়াও সমুদ্রকূলে গড়ে উঠেছিল বন্দর। পরবর্তী যুগে শিল্প উৎপাদনে এবং শিল্পের বিস্তারে জলের চাহিদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে লাগল। তবে উন্নতিশীল এবং অনুন্নত দেশগুলিতে জলের চাহিদা সবচেয়ে বেশি সেচকার্যে। নীল, টাইগ্রিস এবং সিন্ধু অববাহিকায় সেচের জল ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয় ৫০০০ বছর এরও আগে। তবে সেচের জল ব্যবহৃত হত অনেকটা বিক্ষিপ্ত এবং

জলসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ

অবৈজ্ঞানিক ভাবে। ঊনবিংশ শতক থেকে জলবিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের সম্যক জ্ঞানের প্রভাবে বিংশ শতাব্দী থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রচিত এবং রূপায়িত হতে লাগল বড় এবং ছোট সেচ প্রকল্প। পৃথিবীতে বর্তমানে ৬৯% জল ব্যবহৃত হয় সেচের কাজে। তবে ধনী দেশগুলিতে এর পরিমাণ ৪০% এবং দক্ষিণ এশিয়ার অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশে এর পরিমাণ ৯০%। এই দেশগুলির প্রধান কৃষি হল ধান যেখানে জলের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। তবে অবৈজ্ঞানিক এবং লাগামছাড়া জলের ব্যবহার অনেক সময়েই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিরাটভাবে ব্যাহত করে। তাই জলের যথার্থ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ব্যবহারিক দেশ এবং সংস্থার মধ্যে দরকার পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সঠিক সমন্বয়। এর ফলে জলের যেমন যথার্থ সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে তেমনি অপচয়েও অনেকটাই লাঘব করা যাবে।

জলসম্পদ, বিশ্বের চিত্র

আমাদের মাতা বসুন্ধরার জলসম্পদ প্রচুর। এর পরিমাণ দেখলে মনে হবার কারণ নেই যে এই প্রভূত জলভাণ্ডারে কোনোদিন ঘাটতি দেখা দিতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষায় পৃথিবীর মোট জল সম্পদের পরিমাণ ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার। এই প্রভূত পরিমাণ জল স্থলভাগের উপরে ৩০০০ মিটার বেষ্টনি তৈরি করতে পারে। সমুদ্র পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করে আছে এবং এখানেই আবদ্ধ হয়ে আছে পৃথিবীর ৯৭.৩% জল। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ জল লবণাক্ত এবং ব্যবহারের অনুপযুক্ত। Fresh water বা বিশুদ্ধ জলের পরিমাণ কেবলমাত্র ২.৭%। কিন্তু এর আবার ৭৫.২ শতাংশ মেরু অঞ্চলে জমাট বরফ হয়ে রয়েছে। ২২.৬ শতাংশ আবদ্ধ রয়েছে ভূগর্ভে। এই ভূগর্ভের জলের একটা অংশ ব্যবহার করা যায় না, কারণ এর অনেকটাই শিলাস্তরের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট জলের প্রধান উৎস নদী, ঝরনা, হ্রদ, খাল, জলাশয় ইত্যাদি। নদী স্রোতের মাধ্যমে এবং বাষ্পীভবন ও ঘনীভবনের কারণে এবং অনেকটাই সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। পৃথিবীতে তাই বিশুদ্ধ জলের মোট পরিমাণ আনুমানিক ১,০০,০০০ ঘন কিঃ মিঃ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই বিশুদ্ধ জল ভাণ্ডার এই রকম :

সারণি-১		
ব্রাজিল	—	১৭%
রাশিয়া	—	১১%
কানাডা	—	৭%
চীন	—	৭%
ইন্দোনেশিয়া	—	৬%
বাংলাদেশ	—	৬%
মার্কিন যুক্তরাষ্ট	—	৬%
ভারত	—	৫%
অন্যান্য দেশ	—	৩৫%

চীন ও কানাডার জলসম্পদের পরিমাণ প্রায় সমান, কিন্তু কানাডার জনসংখ্যা চীনের ২.৫%। আবার

কালাহারি মরু অঞ্চলে বৎসায়ালা দেশে প্রতিটি জলবিন্দু এতই অমূল্য যে সে দেশের মুদ্রার নাম সোৎসায়ানা ভাষায় "পুলা" রাখা হয়েছে যার অর্থ জল।

জলের প্রাপ্তি অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহারও বিভিন্ন প্রকার। সাহারা অঞ্চলের প্রায় মরুপ্রধান দেশে জল ব্যবহারের পরিমাণ যেখানে মাথাপিছু ১০ থেকে ১২ লিটার, সেখানে ইউরোপীয় দেশগুলিতে এর পরিমাণ ২০০ লিটার।

গত তিন শতকে পৃথিবীর জলের ব্যবহার ৩৫ গুণ বেড়ে গিয়েছে। বছরে এর পরিমাণ আনুমানিক ৩২৪০ ঘন কিমি। এর মধ্যে ৬৯% ব্যবহৃত হয় কৃষিকাজে, ২৩% ভাগ শিল্পে এবং ৮% ভাগ গৃহস্থালির কাজে। তবে স্থান ও সময়ের ব্যতিরেকে এর পরিমাণ বিভিন্ন রকমের। আবার এই জলের কেবলমাত্র এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বেশির ভাগই প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে সমুদ্রে এবং এই সমুদ্র যাত্রার পথে নিয়ে আসছে বন্যার মাধ্যমে ধ্বংসলীলা। তাই সারা পৃথিবীতে বিশুদ্ধ জলের পরিমাণ প্রভূত থাকলেও, বহু স্থানে জলের অনটন অনস্বীকার্য। মানবজীবন জলের উপর একান্ত নির্ভরশীল। তাই বিভিন্ন স্থানে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে অনেক ফারাক থেকে যাচ্ছে, অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন দেশ ও রাজ্যের মধ্যে দেখা দিচ্ছে 'জলযুদ্ধ'। পশ্চিম এশিয়ায় এই জলের অপ্রতুলতা দেখে ভূতপূর্ব রাষ্ট্রসংঘ প্রধান ডাঃ বুত্রোস ঘালি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে পরবর্তী যুদ্ধ হবে রাজনীতি নিয়ে নয়, জল নিয়ে।

বিভিন্ন দেশ, গোষ্ঠী এমনকি বিভিন্ন মানুষও তার জলের প্রাপ্তির পরিমাণ নিয়ে এবং জলসম্পদ রক্ষা করতে বিশেষভাবে সচেতন। প্রকৃতি দেশের সীমানা মানে না, নদীও তাই কত দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়। তাই জলের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে প্রায়শই সংঘর্ষ লেগে যায়। এরকম বহু জল বিবাদের মীমাংসাই হয়নি। পৃথিবীর ১৪৫টি দেশ আন্তর্জাতিক নদী অববাহিকার অন্তর্গত এবং ১৯টি আন্তর্জাতিক নদী পাঁচ এবং তার বেশি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ৭.৮০ লক্ষ বর্গ কিমি আয়তন বিশিষ্ট নদীর অববাহিকা ১৯টি দেশে প্রসারিত। কিন্তু বিশাল আমাজন অববাহিকা ৮টি দেশ বিস্তৃত আবার গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ৬টি দেশের মধ্যে প্রসারিত। নীচের সারণিতে এই আন্তর্জাতিক নদীগুলির চিত্র তুলে ধরা হল :

সারণি-২

ক্রম	নদী অববাহিকা	অববাহিকা আয়তন (বর্গ কিমি)	দেশের সংখ্যা
১।	দানিয়ুব	৭,৭৯,৫০০	১৭
২।	কঙ্গো/জায়ের	৩৬,৯৯,১০০	১১
৩।	নাইজার	২১,১৭,৭০০	১১
৪।	নীল	৩০,৩৮,১০০	১০
৫।	জাম্বেসি	১৩,৮৮,২০০	৯
৬।	রাইন	১,৯৫,০০০	৯
৭।	আমাজন	৬৪,৭৫,০০০	৮
৮।	গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা	১৬,৬৪,৭০০	৬
৯।	মেকং	৭,৮০,৩০০	৬
১০।	টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস	৭,৯৩,৬০০	৬
১১।	সিন্ধু	১০,৮৬,০০০	৪

জলসম্পদ, ভারতবর্ষের চিত্র

সারা বিশ্বের নিরিখে ভারতবর্ষের জলসম্পদ যথেষ্ট নয়। পৃথিবীর ২.৪৫% ভূভাগে বিশ্বের ১৬% জনসংখ্যা বিশিষ্ট ভারতে বিশুদ্ধ জলের পরিমাণ পৃথিবীর কেবলমাত্র ৫%। এর ফলে জল ব্যবহারে অনেক জায়গাতেই ঘাটতি থেকে যায়, দেখা দেয় সংকট। এছাড়া স্থান ও কালবিশেষে এই জলসম্পদের প্রসার সর্বত্র একরূপ নয়।

ভারতে মোট বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১৭০ মিলি মিটার তুষারপাত সমেত মোট অধঃক্ষেপণের মাত্রা ৪০০০ কোটি ঘন কিলোমিটারের সমান। তবে সময় ও স্থানের নিরিখে এই বৃষ্টিপাতের বৈষম্য প্রচুর। দেশের শতকরা ১২ ভাগ স্থানের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬১০ মিমি এর কম। কেবলমাত্র শতকরা ৮ ভাগ স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কেবলমাত্র ২৫০০ মিমির ওপর। বৃষ্টিপাতের তারতম্য এতই বেশি যে মেঘালয়ের পূর্বদিকে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যেখানে ১১,০০০ মিমি যেটি পৃথিবীর সর্বাধিক সেখানে পশ্চিম রাজস্থানের ঊষর জয়শলমীরে এর পরিমাণ কেবলমাত্র ১০০ মিমি। এতটা বৈষম্যের নিদর্শন সারা বিশ্বে কোথাও পাওয়া যাবে না। হিমালয় সংলগ্ন উত্তর ভারতে বর্ষাকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ৮০ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এবং উপকূলবর্তী দক্ষিণ ভারতে এর পরিমাণ ৯০ শতাংশেরও এরও বেশি। স্থান ও কালের নিরিখে এই তারতম্য এতই বেশি যে অতি বৃষ্টির জন্য একদিকে যেমন দেখা যায় বন্যা আবার অনাবৃষ্টির জন্য অন্যত্র দেখা দেয় খরা তাই খরা-বন্যা-খরা পরিস্থিতির দুঃস্বপ্ন আমাদের দেশকে যেন সারাক্ষণই তাড়া করে বেড়ায়।

ভারতবর্ষের মোট বিশুদ্ধ জলের পরিমাণ আনুমানিক ১৯৫৩ ঘন কিমি। তবে জলপ্রবাহ, ভূপৃষ্ঠের গঠনের প্রতিবন্ধকতা হেতু এবং ভূতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতার জন্য ভূপৃষ্ঠের কেবলমাত্র ৬৯৩ কিমি পরিমাণ জলকে ড্যাম, ব্যারেজ ও জলাধারের মাধ্যমে ব্যবহার করা সম্ভব। এছাড়া ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার রয়েছে আনুমানিক ৩৯৩ ঘন কিমি। তাই ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ মোট ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ ১০৮৬ ঘন কিমি যেটি জেলার মোট অধঃ ক্ষেপণের ২৭.১৫ শতাংশ। এই লব্ধজলের ব্যাপ্তি আবার বিচিত্র। দেশের কেবলমাত্র ৩৩.৫% স্থান বিশিষ্ট গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় রয়েছে দেশের ৬২ শতাংশ জলভাণ্ডার। দেশের বিভিন্ন নদী অববাহিকার জলসম্পদদের পরিমাণ পরিশিষ্ট-১-এ দেখান হল।

আয়তনে রাজস্থান রাজ্যটি ভারতের ১০.১১ শতাংশ কিন্তু এখানে জলসম্পদের পরিমাণ কেবলমাত্র ১ শতাংশ। সামান্য বৃষ্টিপাত, ভূগর্ভস্থ জল এবং সীমানা সংলগ্ন নদীর সামান্য ভাগ জলেই রাজ্যের জলের চাহিদা মেটাতে হয়। অনেক স্থানের জলের উৎস থাকে বহুদূরে। তাই এই জলকষ্ট এ রাজ্যের মানুষের নিত্যসঙ্গী। আবার অনেক রাজ্য জলসম্পদের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত। জলসম্পদের ক্ষেত্রেও তাই ভারতবর্ষ এত বিচিত্র। আন্তর্জাতিক নদীর জলবন্টন নিয়ে ভারত তার প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে জলচুক্তি সম্পন্ন করেছে যেমন---

(ক) ৪-১২-১৯৫৯-এ নেপাল সরকারের সঙ্গে গণ্ডক চুক্তি।

(খ) ১৯-৯-১৯৬০-এ পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সিন্ধু নদী জল চুক্তি।

(গ) ২৩-৩-১৯৭৪-এ ভুটান সরকারের সঙ্গে চুখা জল চুক্তি।

(ঘ) ১২-১২-১৯৯৬-এ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে গঙ্গা জলবন্টন চুক্তি।

ভারতের প্রায় ২৭ কোটি মানুষ খরাপ্রবণ স্থানে বাস করে যার আয়তন ১০.৮ লক্ষ বর্গ কিমি যেটি দেশের আয়তনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। তাই সারা দেশের ২৫ শতাংশের মানুষ অল্পবিস্তর খরার শিকার। এই খরার সময়ে ভূগর্ভের জল তুলে নেওয়ার একটা প্রবণতা দেখা দেবেই। ফলস্বরূপ ভূগর্ভস্থ জলস্তর বহু নীচে নেমে যায় এবং দুর্দশা বেড়েই যায়।

এই নিদারুণ প্রতিনিয়ত খরার থেকে নিষ্কৃতির জন্য ভারত সরকার দেশের প্রধান নদীগুলোকে ৩০টি খালের ১০,০০০ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জলপথের মাধ্যমে সংযোগ করার একটি মহতী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্যটি হল পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের অতিরিক্ত জলকে দক্ষিণ ভারতের খরাপ্রবণ অঞ্চলের অতিরিক্ত জলকে দক্ষিণ ভারতের খরাপ্রবণ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা। খাল খনন ও জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে ১৪টি বন্যাপ্রবণ হিমালয় সংলগ্ন নদীকে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে দক্ষিণের গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীসহ ১৭টি নদীর সঙ্গে।

এর ফলে বার্ষিক শস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৪% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হয়। বর্তমানের বার্ষিক ২০ কোটি টন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে গিয়ে ৪৫ কোটি টনে গিয়ে দঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বিশাল পরিমাণ জনসংখ্যার খাদ্য জোগানর জন্য তাই এর গুরুত্ব অপরসীম। প্রায় ৫½ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প সমাধা হতে সময় লাগবে ১৪ বছর। ভারতের প্রধান প্রধান মহানগরীর মাথাপিছু জলের পরিমাণ যথেষ্ট। (সারণি-৩)-এ এর একটি চিত্র তুলে ধরা হল :

মাথাপিছু এই জলের পরিমাণ পশ্চিম ইউরোপের অতি উন্নত দেশের থেকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি, যেমন ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে এর পরিমাণ ১৭৫, ডেনমার্কে ১৬০, ফ্রান্সে ১৫০, বেলজিয়ামে ১৪০ এবং জার্মানিতে ১৩৫। এ থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে এইসব উন্নত দেশগুলো বিশুদ্ধ জলের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে যেমন পানীয় জল এবং মাথাপিছু জল খরচের পরিমাণ কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের দেশেও জলের চাহিদা কমিয়ে আনা এবং অপচয় বন্ধ করার ঐকান্তিক প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

জলসম্পদ, পশ্চিমবঙ্গের চিত্র

প্রকৃতি জলসম্পদে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ভারতবর্ষের কেবলমাত্র ২.৭% স্থানে এখানে ৮.০২% মানুষের বাস, কিন্তু জলসম্পদের পরিমাণ ৭.৫%। যেটি জাতীয় গড়ের থেকে অনেক বেশি। প্রধান দুটি নদী অববাহিকা গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র ছাড়াও এখানে সুবর্ণরেখা নদীর

সারণি-৩

ক্রম	শহরের নাম	মাথাপিছু জলের পরিমাণ লিটার দৈনিক
১।	পুনে পুর এলাকা	২৯৭
২।	বৃহত্তর মুম্বাই পুর এলাকা	২৭২
৩।	দিল্লি পুর এলাকা	২৩৩
৪।	কলকাতা	১৭৯
৫।	লখনউ	১৭৩
৬।	হায়দ্রাবাদ পুর এলাকা	১৭১
৭।	বাঙ্গালোর	১৫৩
৮।	চেন্নাই	১০৭

একটি ছোট অববাহিকা রয়েছে। নদীভিত্তিক অববাহিকা অঞ্চলের পরিমাণ এরকম :

সারণি-৪		
ক্রম	অববাহিকার নাম	আয়তন (বর্গ কিমি)
১।	ব্রহ্মপুত্র	১১,৮৬০
২।	সুন্দরবনসহ গঙ্গা	৭৪,৭৩২
৩।	সুবর্ণরেখা	২,১৬০
	মোট	৮৮,৭৫২

প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ছাড়াও বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়ার ক্ষেত্রেও এখানে অনেক তারতম্য রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একমাত্র রাজ্য যার উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সমুদ্র। হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চল থেকে দক্ষিণের বদ্বীপ ও তটবর্তী অঞ্চলের মধ্যে বৃষ্টিপাতের বৈষম্য অনেকটাই লক্ষ করা যায়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের সর্বাধিক পরিমাণ ৫৩২৩ মিমি বক্সাদুয়ারে এবং সর্বনিম্ন ১১১৪ মিমি বাঁকুড়ার শালতোড়ায়। জেলার মধ্যে সর্বাধিক ৩৯৪৫ মিমি জলপাইগুড়িতে এবং সর্বনিম্ন ১২৮৫ মিমি বীরভূমে।

রাজ্যে মোট জলসম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১৪৭.৫ লক্ষ হে মি। এর মধ্যে ভূপৃষ্ঠের জল এবং ভূ-গর্ভস্থ জল যথাক্রমে ১৩২.৯ লক্ষ হে. মি. এবং ১৪.৬ হে. মি.। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটির হিসেব অনুযায়ী এই জলের বিভাজন এইরকম :

সারণি-৫ পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদ (লক্ষ হে. মি.)		
	লভ্য	ব্যবহারযোগ্য
(ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ	১৩২.৯	৫৩.১
(খ) ভূগর্ভস্থ	১৪.৬	১৪.৬
	১৪৭.৫	৬৭.৭

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদীর অববাহিকা অঞ্চলের পরিমাণ এবং জল সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে পরিশিষ্ট-২ এবং পরিশিষ্ট-৩-এ দেখান হল। ভূ-প্রকৃতির গঠনের সীমাবদ্ধতা এবং বর্তমানের কারিগরি ও ভূতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতার কারণে এবং নদীর প্রবাহের উৎসের দিকে অতিমাত্রায় জল ব্যবহার করার জন্য এই জলের শতকরা ৪০ ভাগ কেবল ব্যবহার করা সম্ভব। এর পরিমাণ ৫৩.১ লক্ষ হে মি ৭৫% ভাগ নির্ভরযোগ্য পরিমাণ এর থেকেও কম। তাই ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ মোট ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ ৬৭.৭ লক্ষ হে. মি.। বিভিন্ন বছরে এবং ভবিষ্যতে এই জলের চাহিদা বিভিন্ন খাতে এইরূপ : (সারণি-৬ দেখুন)

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী প্রতি বর্গ কিমি ৯০৪ জনসংখ্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ঘনত্বের দিক দিয়ে ভারতের সর্বাধিক। গত কয়েক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জমির উপরে চাপ যেমন বেড়েছে, অন্যদিকে তেমনি জলসম্পদকে বিভিন্ন কাজে লাগানো হচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য কৃষিতে এখন জল ব্যবহারের প্রয়োজন ৪৯.৫৯ শতাংশ। এর পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে গিয়ে দাঁড়াবে ৫৯.২২% এবং ২০২৫ সালে ৬৬.১৪%-এ। এই সময়ের ভিতরে শিল্প ও গৃহস্থালির কাজেও জলের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এই জলের জোগান দিতে কৃষির জন্য নির্ধারিত জলের পরিমাণে কমিয়ে আনতে হবে। এর ফলে বৃহৎ ও মাঝারি সেচ প্রকল্পের অধীন শস্য উৎপাদন নির্বাচনের ধারা প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে। জলের সুষম বণ্টন এবং সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। এখানের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই নতুন সংস্রাব্দে জলের ঘাটতি ৪০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে এবং ২০৫০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই সময়ে গোটা ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা একটা স্থিতিশীল অবস্থার দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে স্থান বিশেষে লব্ধ জলের পরিমাণে বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। উত্তরবঙ্গের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার অধীন নদী অববাহিকা অঞ্চলে যেখানে লব্ধ জলের পরিমাণ প্রতিবর্গ কিমিতে ৫৬.৯৭ লক্ষ ঘনমিটার, সেখানে গঙ্গা অববাহিকার অধীন জেলাগুলিতে এর পরিমাণ কেবল ১০.১৭ লক্ষ ঘনমিটার।

জল সংরক্ষণ

জলের ব্যবহার অপরিসীম। বিভিন্ন মৌলিক প্রয়োজন যেমন পানীয় জল, খাদ্য উৎপাদন, অন্যান্য চাষ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও নৌপরিবহন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির জন্য জলের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্ যোজনা সময়কালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ কোটি এবং উৎপাদিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল কেবল ৫ কোটি টন। এই জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন অপ্রতুল হওয়ায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হত। এর পঞ্চাশ বছর পর দেশের

সারণি-৬

ক্রম	বিভিন্ন খাত	বছর		
		২০০০	২০১১	২০২৫
১।	কৃষি	৫৩.৮	৭৭.১	১০৯.৮
২।	গার্হস্থ্য	২.৬	২.৮	৩.৮
৩।	শিল্প	২.৬	৩.৮	৫.৯
৪।	বিদ্যুৎ	৩.১	—	—
৫।	নৌপরিবহন	৩৬.৩	৩৬.৩	৩৬.৩
৬।	অরণ্য	০.১	০.১	০.১
৭।	পরিবেশ উন্নয়ন এবং অন্যান্য	১০.১	১০.০	১০.০
	মোট	১০৮.৫	১৩০.১	১৬৫.৯

জলসম্পদকে কাজে লাগিয়ে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি টনে। যার সাহায্যে দেশের যে জনসংখ্যা তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে তার খাদ্য যোগান দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

তাই জলসম্পদ ব্যবহারের অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে সেচ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রুত নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাতে উত্তরোত্তর জলের চাহিদা বেড়েই চলেছে। জলের এই বিভিন্ন ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকায় সমস্ত ব্যবহারকদেরই একটি অববাহিকার অন্তর্গত ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ দু'রকম জলের ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে, যে কোনো রকম অপচয় বন্ধ করে, সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্ত দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। আবার জীবন ধারণের জন্য দরকার পরিশুদ্ধ জল বিশেষ করে গৃহস্থালির কাজ, পানীয় জল, গবাদি পশু এবং উদ্যান প্রতিপালনের জন্য। জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ গৃহস্থালির জলের ব্যবহারটা মূলত তাঁরাই দেখেন এবং অনেক স্থানেই বিশেষ করে খরাপ্রবণ অঞ্চলে বহু দূর থেকে অনেক সময়েই তাঁরা জল বহন করে নিয়ে আসেন। প্রয়োজন মতো নদী অববাহিকার জল স্থানান্তরের মাধ্যমে লব্ধ জলের সদ্ব্যবহার, ভূগর্ভস্থ জলের যথার্থ সঞ্চারণের মধ্য দিয়ে আগামী বছরগুলোতে জলসম্পদ ব্যবহারের সুষ্ঠু পরিচালনে সবারই আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হতে হবে।

উপসংহার

একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই লব্ধ জল, গ্রহণযোগ্য জল, তার ব্যবহার, সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন সংকটের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। আগামী দিনগুলিতে প্রচণ্ডভাবে জলাভাব অঞ্চলসমূহে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দাঁড়াবে। জলের চাহিদা ও ব্যবহার দুইই খুব বেড়ে গেছে। জলসম্পদের সঠিক মূল্যায়ন এবং যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিভিন্ন মৌলক প্রয়োজনে যেমন খাদ্য উৎপাদন, নিরাপদ আশ্রয়, বস্ত্র, পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে বিশেষভাবে প্রয়াস নিতে হবে। ভবিষ্যতে শিল্পস্থাপন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে জলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই জলের সঞ্চয় এবং সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মনে রেখে জলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশ যাতে বিঘ্নিত না হয় তার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। একদিকে জলের অপচয় বন্ধ করতে যেমন ঐকান্তিক প্রয়াস নিতে হবে, অন্যদিকে তেমনি জলের লাগামহীন এবং অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global warming) আজ জলসম্পদের ওপরে এক বিরাট প্রভাব ফেলছে, নিয়ে আসছে এক বিরাট সংকট। একদিকে যেমন হিমরেখা (Snow-line) আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে হিমবাহগুলি অতি দ্রুত গলতে শুরু করছে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পেতে জলাভূমি শুকিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের এই উপমহাদেশে ক্রমাগত অতিরিক্ত ভূগর্ভের জল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ইতিমধ্যেই এই জলভাণ্ডারে টান পড়েছে। ফলস্বরূপ দেখা দিচ্ছে ঘোরতর সংকট। জলের সঙ্গে চলে আসছে আর্সেনিক ফ্লোরাইডের মতো বিপজ্জনক রাসায়নিক। জলাভূমিকে পানীয় জলের উৎস হিসেবে ব্যবহার করবার পরিকল্পনা সঠিকভাবে নেওয়া হয়নি বলে জনজীবনে নেমে আসছে বিপর্যয়। রাষ্ট্রসংঘের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বের তাপমাত্রা আর তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে জলাভূমির আর কোনও অস্তিত্বই থাকবে না। বিপন্ন হয়ে পড়বে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। এর সঙ্গে গলতে থাকবে হিমবাহগুলি। সব মিলিয়ে জলসংকট হবে তীব্র থেকে তীব্রতর। বৈজ্ঞানিক, জলবিজ্ঞানী, পরিবেশবিদগণ অনেকদিন ধরে সংকটের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন যে জলজনিত সমস্যা সারা বিশ্বে প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকের কাছে এই সমস্যা এখনও বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়নি। এমন দিনও আসতে পারে যখন পেট্রোলিয়ামের মতো প্রতি জলবিন্দু মহার্ঘ হয়ে দাঁড়াবে। পরিবেশের ওপর কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে জলের সুব্যবহার এবং সুষম বণ্টনের জন্য সমস্ত ব্যবহারিকগণের সর্বাগ্রে প্রয়াস নেওয়া দরকার। তাই প্রয়োজন বুঝে জলের এখন নামকরণ করা হয়েছে 'Blue Gold' বা নীল সোনা।

পরিশিষ্ট-১

ভারতের বিভিন্ন প্রধান প্রধান নদী অববাহিকার জলসম্পদের পরিমাণ

ক্রম	নদী অববাহিকার নাম	অববাহিকা অঞ্চল (বর্গ কিমি)	গড় জলসম্পদের পরিমাণ (১০০ কোটি ঘন মিঃ)	ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ (১০০ কোটি ঘন মিঃ)
১।	সিন্ধু	৩,২১,২৮৯	৭৩.৩	৪৬
২।	গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা			
	(ক) গঙ্গা	৮,৬১,৪৫২	৫২৫	২৫০
	(খ) ব্রহ্মপুত্র	১,৯৪,৪১৩	৫৩৭.২	২৪
	(গ) বরাক ও অন্যান্য	৪১,৭২৩	৪৮.৪	—
৩।	গোদাবরী	৩,১২,৮১২	১১০.৫	৭৬.৩
৪।	কৃষ্ণা	২,৫৮,৯৪৮	৭৮.১	৫৮
৫।	কাবেরী	৮১,১৫৫	২১.৪	১৯
৬।	সুবর্ণরেখা	২৯,১৯৬	১২.৪	৬.৮
৭।	ব্রাহ্মণী-বৈতরণী	৫১,৮২২	২৮.৫	১৮.৩
৮।	মহানদী	১.৪১,৫৮৯	৬৬.৯	৫০
৯।	পেন্নার	৫৫,২১৩	৬.৩	৬.৯
১০।	মাহি	৩৪,৮৪২	১১	৩.১
১১।	সবরমতী	২১,৬৭৪	৩.৮	১.৯
১২।	নর্মদা	৯৮,৭৯৬	৪৫.৬	৩৪.৫
১৩।	তাপ্তি	৬৫,১৪৫	১৪.৯	১৪.৫
১৪।	তাপ্তি ও তাদ্রির মধ্যবর্তী পশ্চিমমুখী প্রবাহিত নদীসমূহ	৫৫,৯৪০	৮৭.৪	১১.৯
১৫।	তাদ্রি ও কন্যাকুমারীর মধ্যবর্তী পশ্চিমমুখী প্রবাহিত নদীসমূহ	৫৬,১৭৭	১১৩.৫	২৪.৩
১৬।	মহানদী ও পেন্নারের মধ্যবর্তী পূর্বমুখী প্রবাহিত নদীসমূহ	৮৬,৬৪৩	২২.৫	১৩.১
১৭।	পেন্নার ও কন্যাকুমারীর মধ্যবর্তী পূর্বমুখী নদীসমূহ	১,০০,১৩৯	১৬.৫	১৬.৪
১৮।	লুনি-সহ কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী পশ্চিমমুখী নদীসমূহ	৩,২১,৮৫১	১৫.১	১৫
১৯।	রাজস্থানের মধ্যমতী নিকাশি অঞ্চল	—	সামান্য	—
২০।	অন্যান্য ছোট নদীসমূহ	৩৬,২০২	৩১.১	—
	মোট		১৮৬৯.৪	৬৯০

পরিশিষ্ট-২

পশ্চিমবঙ্গের নদী অববাহিকা অঞ্চল

ক্রম	মূল অববাহিকা	উপ-অববাহিকা	আয়তন (বর্গ কিমি)
১।	ব্রহ্মপুত্র	(১) সংকোশ	১৭২
		(২) রায়ডাক	৮০৭
		(৩) তোর্সা-কালজানি	৩,৪১৯
		(৪) জলঢাকা	৩,৭৪৬
		(৫) তিস্তা	৩,৭১৬
	ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা মোট		১১,৮৬০
২।	গঙ্গা	(১) মহানন্দা	৯,৪৬০
		(২) পুনর্ভবা	৭৩০
		(৩) আত্রাই	৯১০
		(৪) পাগলা-বাঁশলই	৯৩০
		(৫) ব্রাহ্মণী-দ্বারকা	২,৫০০
		(৬) ভাগীরথী-হুগলি	১,১৭০
		(৭) জলঙ্গি	৫,৩৪৪
		(৮) ময়ূরাক্ষী	২,৭২০
		(৯) অজয়	২,৪৫০
		(১০) খড়ি-গাংগুর-ঘিয়া	৪,৪৬০
		(১১) চূর্ণী	৮০০
		(১২) দামোদর	৫,২৫০
		(১৩) দ্বারকেশ্বর	৪,৬১৯
		(১৪) চব্বিশ পরগনা এবং কলকাতা বন্দর এলাকা	৪,৪৩০
		(১৫) কংসাবতী	৮,৩৬৯
		(১৬) শিলাবতী	৩,৯৫২
		(১৭) রূপনারায়ণ	২,৫৪৮
		(১৮) পিচাবনি	৮২০
		(১৯) রসুলপুর	১,১৩০
		(২০) হলদি	১৮০
		(২১) সুন্দরবন অঞ্চল	১১,৬১৩
	গঙ্গা অববাহিকা মোট		৭৪,৭৩২
৩।	সুবর্ণরেখা	সুবর্ণরেখা	২,১৬০
	পশ্চিমবঙ্গ মোট		৮৮,৭৫২

পরিশিষ্ট-৩

পশ্চিমবঙ্গের উপত্যকাভিত্তিক জলসম্পদ (দশ লক্ষ ঘন মিটার)

ক্রম	অববাহিকা অঞ্চল	ভূপৃষ্ঠের জল	ভূগর্ভস্থ জল	মোট জলসম্পদ
১।	সংকোশ	১,৩৬৫	৪১	১,৪০৬
২।	রায়ডাক	৬,৬৬৬	২৪৬	৬,৯১২
৩।	তোর্সা-কালজানি	১১,৯০৮	১,২৯৫	১৩,২০৩
৪।	জলঢাকা	১২,৬৬৫	৮২২	১৩,৪৮৭
৫।	তিস্তা	৩২,১২৪	৪৩৯	৩২,৫৬৩
৬।	মহানন্দা	১৩,৩৩৪	১,৪২৫	১৪,৭৫৯
৭।	পুনর্ভবা	১,০৩৪	২১১	১,২৪৫
৮।	আত্রাই	৪৮৭	১৭২	৬৫৯
৯।	পাগলা-বাঁশলই	৫৯১	১৬২	৭৫৩
১০।	ব্রাহ্মণী-দ্বারকা	১,৯৫৭	৬২৯	২,৫৮৬
১১।	ময়ূরাক্ষী	২,৫৯০	৭৯৮	৩,৩৮৮
১২।	অজয়	২,৫০৯	৮১০	৩,৩১৯
১৩।	দামোদর	৮,৯২৪	৮৭৭	৯,৮০১
১৪।	দ্বারকেশ্বর-গন্ধেশ্বরী	৩,৩৩০	৬৩৮	৩,৯৬৮
১৫।	শিলাবতী	২,০৬৮	৭০৯	২,৭৭৭
১৬।	কংসাবতী	৩,২৩৩	৬৫৩	৩,৮৮৬
১৭।	কেলেঘাই	৮১৮	২৫৩	১,০৭১
১৮।	জলঙ্গি	৩,৭০৭	৯৬৪	৪,৬৭১
১৯।	ভাগীরথী	১৩,৬৪৩	২,৪০৮	১৬,০৫১
২০।	রূপনারায়ণ	১,১৮৮	৬৩	১,২৫১
২১।	সুবর্ণরেখা	৩,৬৪৫	২৪১	৩,৮৮৬
২২।	চব্বিশ পরগনা নিকাশি নদী	৩,৯২৯	৬৩৯	৪,৫৬৮
২৩।	পিচাবনি	৪৬২	৪৪	৫০৬
২৪।	রসুলপুর	৪০১	৩৯	৪৪০
২৫।	হলদি	৩২৭	১	৩২৮
	পশ্চিমবঙ্গ মোট	১,৩২,৯০৫	১৪,৫৭৯	১,৪৭,৪৮৪

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার

REFERENCES

1. Himalayan Water... Bhim Subba, The Panos Institute, South Asia
2. Integrated Water... Resources Development & Management, Indian Water Resources Society, 2002
3. Secretary, Expert Committee, of Irrigation, Govt of West Bengal, 1987
4. Time, April 9, 2001
5. National Geographic, September, 2001

অনুকৃতি বা মডেল—জলপ্রবাহ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি

মানিক দে

এই অজানা অচেনা বিশ্বকে জানা ও চেনার অপরিসীম চেষ্টার ফলশ্রুতি বিজ্ঞানের অগ্রগতি। এই অগ্রগতির প্রথম সোপান—ঘটনাসমূহের পর্যবেক্ষণ ও নিরন্তর নিরীক্ষণ। পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের বিচারবিশ্লেষণ ও গবেষণা—অগ্রগতির দ্বিতীয় সোপান। বিশ্লেষণ ও গবেষণালব্ধ ফল মানব সভ্যতার কল্যাণের কাজে ব্যবহারেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। জল মানবসভ্যতার উন্নতির পথে একটি অপরিহার্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বিভিন্ন নদ-নদীর পাড়েই গড়ে উঠেছে একের পর এক মহান সাম্রাজ্য ও আধুনিক মানবসভ্যতা। কোথাও বা জলের চরম সংকট কোথাও বা ভয়াবহ বন্যার তাণ্ডব। নদীর গতিপথ সর্বদা পরিবর্তনশীল। এর এক পাড় ভাঙছে কিংবা আর এক পাড় গড়ছে। কিন্তু আমরা নিজেদের প্রয়োজনে এর গতিপথ কোথাও বা বেঁধে দিচ্ছি কোথাও বা সংকীর্ণ করে দিচ্ছি। নদীর জলকে জনকল্যাণে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার জন্য দরকার নদীর গতি-প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, নদীর জলের উচ্চতা, বেগ, জলপ্রবাহের পরিমান ও দিক্ পরিবর্তনের নিরন্তর পর্যবেক্ষণ দরকার, নদীর কোনো সমস্যা যেমন ভাঙন, গতিপথের পরিবর্তন বা পলি জমার সমাধানের জন্য প্রয়োজন পর্যবেক্ষণলব্ধ সংগৃহীত তথ্যের বিচার ও বিশ্লেষণ, বাঁধ (Dam), ব্যারেজ প্রভৃতি তৈরি করার আগে বিভিন্ন তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ খুবই জরুরি। এই সব তথ্যসমূহের বিচার- বিশ্লেষণের এক প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হচ্ছে অনুকৃতি বা মডেলের সাহায্যে গবেষণা।

তথ্যসমূহের বিচার-বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার : অনুকৃতি বা মডেল

কোনো বস্তুর ক্ষুদ্রাকার নকল বা প্রতিরূপকে অনুকৃতি বলা যেতে পারে। অনুকৃতি মূলত দুরকম।

(১) ভৌত অনুকৃতি (Physical Model) (২) গাণিতিক অনুকৃতি (Mathematical Model)

ভৌত অনুকৃতি (Physical Model)

এখানে আদিরূপের (Prototype) একটি ছোট অনুকৃতি তৈরি করা হয় পলি ও অন্যান্য পদার্থ দ্বারা। আদিরূপের বিভিন্ন তথ্য যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বিভিন্ন অংশের গভীরতা, জলতলের উচ্চতা, জলের গতিবেগ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে একটি অনুকৃতি এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে অনুকৃতির তরল-প্রবাহ আদিরূপের জল-প্রবাহকে অনুকরণ করে। এই অনুকৃতির তরল পদার্থের গতি-প্রকৃতি থেকে আদিরূপের জলপ্রবাহের গতি-প্রকৃতি কি হতে পারে সে একটা ধারণা করা যায়। ভৌত অনুকৃতি কতগুলি প্রাথমিক নিয়মাবলির উপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়।

তিন ধরনের চলরাশি (variable) প্রধানত তরলের গতি-প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(১) তরলের গতিপথের জ্যামিতিক আকৃতি—যেমন নদী, খাল ইত্যাদির আকৃতি।

(২) তরলের ভৌতধর্ম—যেমন ঘনত্ব (ρ), সান্দ্রতা (viscosity, μ), পৃষ্ঠটান (Surface tension, σ), স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity, e)।

(৩) বহিরাগত বল—যেমন চাপ (Pressure, p), অভিকর্ষ (g) ইত্যাদি।

নদীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে যে অনুকৃতি তৈরি করা হয় তা আসলে নদীর একটি ছোট জ্যামিতিক প্রতিরূপ। ধরা যাক, নদীর সমস্যা সমাধানে ৫ কিমি. অংশের একটি অনুকৃতি তৈরি করা প্রয়োজন। যদি নদীর ১০০ রৈখিক একককে অনুকৃতিতে ১

রৈখিক একক দিয়ে নির্দেশ করা হয় তবে অনুকৃতির দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ৫০ মিটার। এখানে মাপনীর অনুপাত (Scale ratio) ১/১০০।

একটি অনুকৃতি তৈরি করার সময় আমরা দুটো বিষয় পছন্দমত নির্বাচন করতে পারি। (১) অনুকৃতিতে ব্যবহৃত তরল পদার্থ (২) অনুকৃতির মাপনী (Scale of the model)।

তরল প্রবাহের সাধারণ সমীকরণ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়।

$V = F(a, b, c, d, \rho, \mu, \sigma, e, p, g)$ ...(১)

এখানে V—তরলপ্রবাহের গতি (velocity), a, b, c, d ইত্যাদি রৈখিক চলরাশি দ্বারা তরলের গতিপথের জ্যামিতিক আকৃতি প্রকাশ করা হয়। (১) নং সমীকরণকে সরল গাণিতিক পরিবর্তনের সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

$$\frac{v^2}{p/\rho} = Af\left(\frac{a}{b}, \frac{a}{c}, \frac{a}{d}, \frac{v^2}{ay}, \frac{va}{\mu/\rho}, \frac{v^2a}{\sigma/\rho}, \frac{v^2}{e/\rho}\right) \text{....(২)}$$

এখানে A একটি ধ্রুবক।

যদি (১) নং সমীকরণে বর্ণিত চলরাশি ছাড়া অন্যান্য চলরাশি তরল- প্রবাহের উপর যথেষ্ট প্রভাব না ফেলে তবে (২) নং সমীকরণ অনুকৃতি ও আদিরূপ উভয় ক্ষেত্রেই তরলপ্রবাহের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

যদি অনুকৃতি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে নির্বাচিত তরলপ্রবাহের উপর অভিকর্ষ (g), সান্দ্রবল (viscous force), স্থিতিস্থাপকতা (e), পৃষ্ঠটানের (σ), প্রভাব আদিরূপে এই বলসমূহের প্রভাবের অনুরূপ হয় তবে $\left(\frac{v^2}{p/\rho}\right)$ এর মান অনুকৃতি ও আদিরূপ উভয়ক্ষেত্রেই সমান হবে। ফলত অনুকৃতি থেকে প্রাপ্ত $\left(\frac{v^2}{p/\rho}\right)$-এর মান থেকে আদিরূপের $\left(\frac{v^2}{p/\rho}\right)$-র মান সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব।

এক্ষেত্রে (২) নং সমীকরণের ডানদিকের প্রত্যেকটি স্থিতিমাপ (Parameter) অনুকৃতি ও আদিরূপে উভয়ক্ষেত্রেই সমান।

জ্যামিতিগতভাবে অনুকৃতি আদিরূপের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ হলে (২) নং সমীকরণের রৈখিক অনুপাত a/b, a/c, a/d প্রভৃতির সাংখ্যমান উভয়ক্ষেত্রেই সমান হবে। (২) নং সমীকরণের অন্যান্য রাশি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

$\frac{v^2}{ga} = \lambda = F^2$, এখানে F ফ্রাউড নাম্বার (Froud Number), তরলের গতি সম্পর্কিত এই অন্যতম উপাদান প্রথমে ব্যবহার করেন রেবক (Rebbock) এটি তরলপ্রবাহের উপর অভিকর্ষ বলের প্রভাব নির্দেশ করে।

$\frac{Va}{\mu/\rho} = R$, R রেনল্ডস্ নাম্বার (Reynolds Number)। তরলপ্রবাহের উপর সান্দ্র বলের (viscous force) প্রভাব নির্দেশ করে।

$\frac{V^2a}{\mu/\rho} = W$, W ওয়েবার নাম্বার (Weber Number)। তরলপ্রবাহের উপর পৃষ্ঠটানের প্রভাব নির্দেশ করে।

$\frac{V^2}{e/\rho} = C$, C কচি নাম্বার (Cauchy Number)। তরলপ্রবাহের উপর স্থিতিস্থাপক বলের প্রভাব নির্দেশ করে।

ধরা যাক আদিরূপের L রৈখিক একককে অনুকৃতিতে 1 রৈখিক এক দ্বারা নির্দেশ করা হল। এক্ষেত্রে জ্যামিতিক মাপনীর অনুপাত $1/_L$। ধরা যাক সূচক m ও p দ্বারা যথাক্রমে অনুকৃতি (model) ও আদিরূপকে (prototype) নির্দেশ করা হল। আদিরূপের আদর্শ অনুকৃতি তৈরি করতে হলে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণ হওয়া দরকার।

(১) $\lambda_m = \lambda_p$ (২) $R_m = R_p$

(৩) $W_m = W_p$ (৪) $C_m = C_p$

(১) নং শর্ত থেকে আমরা পাই $\frac{V_m}{V_p} = \sqrt{\frac{1}{2}}$ .... (ক)

অনুকৃতি ও আদিরূপে একই তরল ব্যবহার করলে (২) নং শর্ত থেকে আমরা পাই $\frac{V_m}{V_p} = L$ .... (খ)

(ক) ও (খ) সমীকরণদ্বয় একই সঙ্গে সত্য হতে হলে L = ১ হতে হবে। অর্থাৎ অনুকৃতি ও আদিরূপ একই মাপের হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং অনুকৃতি ও আদিরূপে একই তরল ব্যবহার করলে λ ও R উভয়ের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হওয়া সম্ভব নয়।

অনুকৃতি ও আদিরূপে একই তরল ব্যবহার করলে (৩) নং শর্ত থেকে আমরা পাই $\frac{V_m}{V_p} = \sqrt{L}$ .... (গ)

সুতরাং আদিরূপ ও অনুকৃতিতে একই তরল পদার্থ ব্যবহার করলে উপরোক্ত বলসমূহের সমতায় শর্ত একই সঙ্গে পূরণ করা সম্ভব নয়। প্রকৃতিতে অনুকৃতির জন্য এমন কোনো তরল পাওয়া অসম্ভব যা একসঙ্গে সবকটি সমতার শর্ত পূর্ণ করবে। সুতরাং এমন কোনো ভৌত অনুকৃতি তৈরি করা সম্ভব নয় যাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা সম্ভব। এর জন্য ভৌত অনুকৃতির সাহায্যে গবেষণার উপযোগিতা নিয়ে সন্দিহান হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উপরোক্ত আলোচিত মৌলিক সূত্রগুলির কিছু সরলীকরণ করা হয়। তরলপ্রবাহজনিত সমস্যাগুলিকে বিভিন্ন বলের প্রাধান্য অনুযায়ী কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন নদীতে জলপ্রবাহ- জনিত সমস্যায় অভিকর্ষ বলই প্রধান মুখ্য বল হিসাবে কাজ করে। যে সব সমস্যার ক্ষেত্রে অভিকর্ষ বল মুখ্যবল হিসেবে কাজ করে, সেখানে জ্যামিতিক সাদৃশ্য ও ফ্রাউড নাম্বার-এর সমতার উপর প্রধানত জোর দেওয়া হয়। অনুকৃতি ও আদিরূপের তরলের বেগ (velocity), একক সময়ে তরলপ্রবাহের এক্ষেত্রে পরিমাণ (dis-charges, Q) তরলপ্রবাহের সময় (T) ইত্যাদির মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

ধরা যাক্ অনুকৃতির রৈখিক অনুপাত ১/১০০

সমীকরণ (ক) থেকে পাই (অভিকর্ষ বল মুখ্য বল হিসেবে কাজ করলে)

$$\frac{V_m}{V_p} = \sqrt{\frac{1}{L}} = \sqrt{\frac{১}{১০০}} = \frac{১}{১০}$$

এখানে অনুকৃতিতে তরলের বেগ ১ ফুট/সেকেন্ড হলে আদিরূপে জলের বেগ ১০ ফুট/সেকেন্ড নির্দেশ করে।

এখানে অনুকৃতিতে তরলপ্রবাহের পরিমাণ ১ কিউসেক (Cusec) হলে আদিরূপে জলপ্রবাহের পরিমাণ ১০০,০০০ কিউসেক নির্দেশ করে।

$$\frac{Q_m}{Q_p} = \frac{(\text{ক্ষেত্রফল} \times \text{বেগ})_m}{(\text{ক্ষেত্রফল} \times \text{বেগ})_p} = \frac{(\text{ক্ষেত্রফল})_m}{(\text{ক্ষেত্রফল})_p} \times \frac{V_m}{V_p} = \frac{1}{L^2} \times \frac{1}{L^{1/2}} = \frac{1}{L^{5/2}} = \frac{1}{(10)^5}$$

অর্থাৎ অনুকৃতিতে ১ সেকেন্ড সময় আদিরূপে ১০ সেকেন্ড সময় নির্দেশ করে।

একইভাবে অনুকৃতিতে জলতলের উচ্চতা ১ ফুট আদিরূপে জলতলের উচ্চতা ১০০ ফুট নির্দেশ করে।

$$\frac{T_m}{T_p} = \frac{\left(\frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{বেগ}}\right)_m}{\left(\frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{বেগ}}\right)_p} = \frac{(\text{দৈর্ঘ্য})_m}{(\text{দৈর্ঘ্য})_p} \times \frac{V_p}{V_m} = \frac{1}{L} \times L^{1/2} = \frac{1}{L^{1/2}} = \frac{1}{10}$$

যে সব সমস্যার ক্ষেত্রে সান্দ্রবল মুখ্য ভূমিকা নেয় সেক্ষেত্রে অনুকৃতি ও আদিরূপে রেনল্ডস্ নাম্বারের (R) সমতার উপর নির্ভর করে নতুন সম্পর্ক পাওয়া যায়।

নদী সংক্রান্ত বেশির ভাগ সমস্যা সমাধানে অভিকর্ষবলই প্রধান ভূমিকা নেয়। ফলত অনুকৃতি তৈরির ক্ষেত্রে জ্যামিতিক সাদৃশ্য ও Froud No.-এর সমতা রক্ষাই মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। অনুকৃতির রৈখিক মান ইচ্ছামতো ছোট করা যায় না। কেননা এক নির্দিষ্ট সীমার বাইরে রৈখিক অনুপাত কমিয়ে আনলে মান্দ্রতা ও পৃষ্ঠটান অনুকৃতিতে তরল- প্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

যদিও অনুকৃতি তৈরির ক্ষেত্রে জ্যামিতিক সাদৃশ্য মুখ্য ভূমিকা নেয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুকৃতি তৈরির সময় জ্যামিতিক সাদৃশ্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। বন্যা ও ভূমিক্ষয় সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে নদীর এক বড় লম্বা অংশের অনুকৃতি তৈরি করার প্রয়োজন হয়ে ওঠে। অনুকৃতি তৈরি করার সময় আনুভূমিক রৈখিক মান (Horizontal Scale) খুবই ছোট করা প্রয়োজন হয়। সাধারণত নদীর প্রস্থের তুলনায় নদীর গভীরতা অনেক কম। ফলত আনুভূমিক রৈখিক মান (Horizontal Scale) ও খাড়াই রৈখিক মান (Vertical Scale) সমান রাখা সম্ভব হয় না। কেননা এক্ষেত্রে অনুকৃতিতে খাড়াই অংশ এত অগভীর হয় যে অনুকৃতিতে জলের গভীরতা খুবই কম হয়। ফলত সান্দ্রতা ও পৃষ্ঠটান প্রবলভাবে প্রভাব ফেলে, যদিও আদিরূপে সান্দ্রতা ও পৃষ্ঠটানের কোনো প্রভাব নেই। সান্দ্রবল ও পৃষ্ঠটানের প্রভাব কমানোর জন্য খাড়াই রৈখিক মান বাড়ানো হয় যাতে অনুকৃতিতে জলতলের গভীরতা ও জলপ্রবাহের বেগ বৃদ্ধি পায়। এরকম অনুকৃতিতে খাড়াই রৈখিক মান, আনুভূমিক রৈখিক মান থেকে ভিন্ন হয়, এর ফলে জ্যামিতিক আকৃতিতে এক বিকৃতি ঘটে। এই বিকৃতির মান খুব বেশি হলে অনুকৃতিতে তরলপ্রবাহের বেগ ও চাপের শ্রেণিভাগে গুরুতর বিকৃতি ঘটে। অনুকৃতির তলদেশের চলন বা গতি আদিরূপের তলদেশের চলন বা গতির অনুরূপ হতে হলে রৈখিক মাপনির এই বিকৃতির প্রয়োজন হয়। যদিও অনুকৃতিতে কোনো জ্যামিতিক সাদৃশ্য থাকে না তথাপি এই অনুকৃতি থেকে প্রাপ্ত ফলসমূহ আদিরূপকে নির্ভরযোগ্যভাবে প্রকাশ করে। অনুকৃতি তৈরির সময় এই বিকৃতির মান যথাযোগ্যভাবে নির্ধারণ করা এক প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠে। অনুকৃতি ও আদিরূপের ফ্রাউড নাম্বারের সমতার ক্ষেত্রে কোনোরকম রূপ আপস করা হয় না, যদিও জ্যামিতিক সাদৃশ্যে কিছুটা বিকৃতি মেনে নেওয়া হয় সান্দ্রতা ও পৃষ্ঠটানের প্রভাব কমানোর জন্য। আদিরূপে বিভিন্ন জলপ্রবাহে জলতলের উচ্চতা ও জলের বেগের মধ্যকার সম্পর্ক অনুকৃতিতে সমতুল জলপ্রবাহের জন্য জলতলের উচ্চতা ও জলের বেগের সম্পর্ক একই প্রকার করার চেষ্টা করা হয়। এই সম্পর্ক ভিন্ন প্রকার হলে, রৈখিক মান, বিকৃতি, অনুকৃতির তলদেশের ঘর্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের পরিবর্তন এমনভাবে করা হয় যাতে জলতলের উচ্চতা ও জলপ্রবাহের সম্পর্কের আদিরূপ, অনুকৃতিতে প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন রকম নদীর সমস্যা—যেমন নদীর পাড় ভাঙন, বন্যা, বাঁধ, ব্যারেজ প্রভৃতি নির্মাণগত সমস্যা—এই অনুকৃতি গবেষণা দ্বারা সমাধান করা সম্ভব।

আদিরূপের জলপ্রবাহের বিভিন্ন ধর্ম, অনুকৃতির জলপ্রবাহ দ্বারা ঠিকমতো প্রতিফলিত হলে, ওই অনুকৃতিকে আদিরূপের আদর্শ অনুকৃতি বলা যেতে পারে। ধরা যাক নদীতে একটি ব্যারেজ তৈরি করা হবে। নদীর অনুকৃতিতে সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে ব্যারেজের অনুকৃতি তৈরি করে, অনুকৃতিতে ব্যারেজের উপর অংশে ও নীচের অংশে কী প্রভাব হচ্ছে, কী ধরনের চড়া পড়ছে তা দেখা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যারেজের নির্মাণের সবচেয়ে উপযোগী স্থান কী হওয়া উচিত তা বলা যায়। একইভাবে পাড় ও জলপ্রবাহের দিকের সঙ্গে কত ডিগ্রি কৌণিক মানে ব্যারেজ নির্মাণ করা দরকার তার বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। অনুকৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য সোজাসুজি আনুপাতিক হারে মান বৃদ্ধি করে আদিরূপের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। অনুকৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য যথাযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়াও নদীর আদিরূপের স্বভাব-ধর্মের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া হল। কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্য আমাদের নদী বিজ্ঞান মন্দির ও ভারতবর্ষের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাইড্রলিক প্রতিষ্ঠান একই গবেষণা করেছিল। প্রকল্পটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল

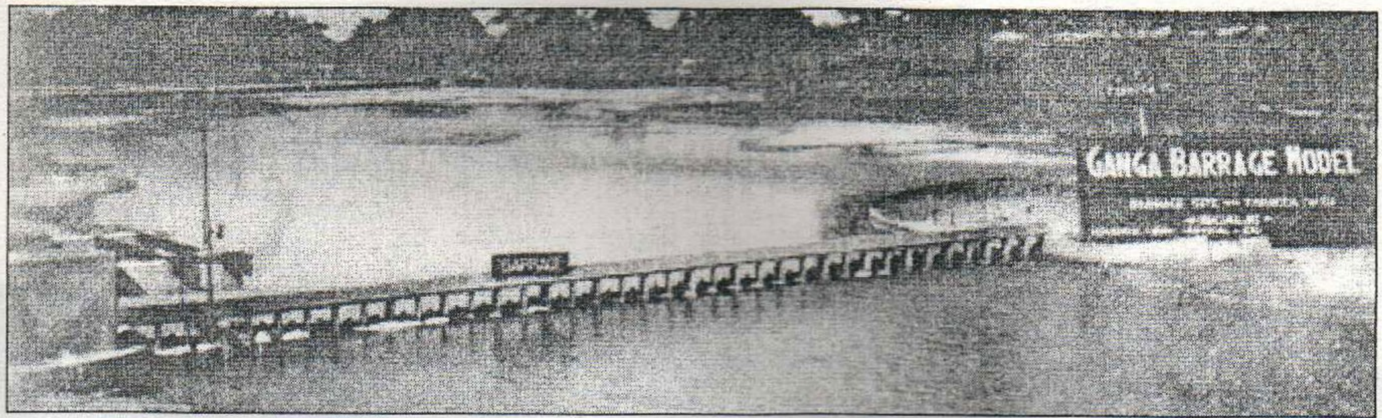

অনুকৃতি : গঙ্গা ব্যারেজ মডেল

যে এক প্রতিষ্ঠানের থেকে প্রাপ্ত গবেষণালব্ধ ফল অপর প্রতিষ্ঠানের গবেষণালব্ধ ফল দিয়ে যাচাই করার প্রয়োজন ছিল। বিষয়টি ছিল প্রকল্পটির মূল কাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে সেলুলার কফার ড্যাম (Cellular Coffer Dam) ব্যবহার করা সম্ভব কিনা। উভয় প্রতিষ্ঠানই অনুকৃতির সাহায্যে গবেষণা চালিয়েছিল প্রকল্পটির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া সেলুলার কফার ড্যামের নকশার উপর ভিত্তি করে, অনুকৃতি দ্বারা গবেষণালব্ধ ফল উভয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রায় একইরকম হয়েছিল। অন্যতম প্রতিষ্ঠানটি সেলুলার ড্যাম ব্যবহারের পক্ষে রায় দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের নদী বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষকদের নদীর আদিরূপের সঙ্গে বিশেষ পরিচিতি থাকায় রায় বিপক্ষে গিয়েছিল। এই বিষয়টি High Power Technical Committee-তে বিতর্কের সৃষ্টি করে। অতঃপর ঠিক হয় আদিরূপে পরীক্ষামূলক গবেষণার দরকার। ১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মের সময় নদীর তলদেশে এক পরীক্ষামূলক কাঠামো নির্মাণ করা হয়। প্রথম বর্ষাতেই তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ফলত সেলুলার কফার ড্যাম ব্যবহারের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়। এর মানে এই নয় যে অন্য প্রতিষ্ঠানটির অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব ছিল। আসলে আমাদের ওই নদীর চরিত্র সম্বন্ধে অনেক বেশি সম্যক জ্ঞান ছিল।

গাণিতিক অনুকৃতি (Mathematical Model)

গাণিতিক অনুকৃতি আসলে ভৌত সম্পর্কের এক পরিমাণগত গাণিতিক বর্ণনা। অন্য কথায় কতগুলি গাণিতিক সমীকরণ, যুক্তিযুক্ত বর্ণনা ইত্যাদির সমাজ।

কোনো প্রণালী বা নদীর অনুকৃতি তৈরি করার জন্য জলপ্রবাহের ধর্মের উপর নির্ভর করে প্রধানত দু'প্রকার সমীকরণ ব্যবহার করা হয়। ভৌত অনুকৃতিতে তরলপ্রবাহের গতি সম্পর্কিত সমীকরণগুলি ব্যবহারিক প্রয়োগের সাহায্যে স্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়। গাণিতিক অনুকৃতিতে এই সমীকরণগুলি বিভিন্ন গণনার সাহায্যে স্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়। কম্পিউটারের সাহায্যে এই গণনার কার্য খুব দ্রুত, নিখুঁতভাবে করা সম্ভব। এখানে নদী বা প্রণালীর আদিরূপকে এক আয়তাকার খাল বা প্রণালী দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়। পরিকল্পিত এই প্রণালীটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে এর বিভিন্ন মাত্রা ধ্রুবক হয়। এক অনিয়মিত নদীকে দৈর্ঘ্য বরাবর কতগুলি অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক অংশকে পরিকল্পনামাফিক এমনভাবে তৈরি করা হয় যে প্রত্যেক অংশের বিভিন্ন মাত্রা ধ্রুবক হয়। প্রত্যেক অংশের তলদেশের ঢালের মান ও ধ্রুবক হয়। এই রূপ পরিকল্পিত প্রণালী তৈরি করার জন্য প্রণালীর আদিরূপের বিশদ ও নিখুঁত জরিপ করা প্রয়োজন হয়।

এইভাবে প্রাপ্ত বিশদ তথ্য থেকে প্রণালীর আদিরূপের প্রত্যেক অংশের পরিকল্পিত আয়তাকার প্রণালী তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিতে গণনাকার্যের সময় তরলের উচ্চতা ও তরলপ্রবাহের মানের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করার সময় তরলপ্রবাহ সাধারণত এক মাত্রিক ও তরলের বেগকে গড় বেগ ধরা হয়। যদি গণনাপ্রাপ্ত তরলের উচ্চতা ও প্রবাহ মানের মধ্যেকার সম্পর্ক পর্যবেক্ষণপ্রাপ্ত আদিরূপের সম্পর্কের সঙ্গে এক হয়ে তবে উক্ত গাণিতিক অনুকৃতিকে আদিরূপের প্রতিরূপ হিসাবে ধরা যেতে পারে।

দীর্ঘ যাট বছরে পশ্চিমবঙ্গ নদী বিজ্ঞান মন্দিরে অনুকৃতির সাহায্যে একাধিক গবেষণা করা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) ময়ূরাক্ষী প্রকল্প (২) দামোদর উপত্যকা প্রকল্প (৩) কংসাবতী জলাধার প্রকল্প (৪) ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প (৫) তিস্তা নদীর অনুকৃতি (৬) টালির নালার অনুকৃতি (৭) দীঘার তটভূমির ক্ষয় সংক্রান্ত সমস্যার অনুকৃতি ইত্যাদি।

এ ছাড়াও কিছু গাণিতিক অনুকৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) সুন্দরবন ব-দ্বীপ প্রকল্প (২) নিম্ন দামোদর ইত্যাদি।

অনুকৃতি নদী সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। নদীর তলদেশের ক্ষয়, পাড় ভাঙন ইত্যাদি সমস্যা সমাধানে ভৌত অনুকৃতি বিশেষভাবে কার্যকর ভূমিকা নেয়। বন্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে গাণিতিক অনুকৃতি বিশেষ ফলদায়ক।

লেখক : উপ-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ নদী বিজ্ঞান মন্দির, সেচ ও জলপথ দপ্তর

উন্নয়ন

মহানন্দা, মহিষমারী ও পঞ্চাই নদীর বন্যা

বাণী সাঁতরা

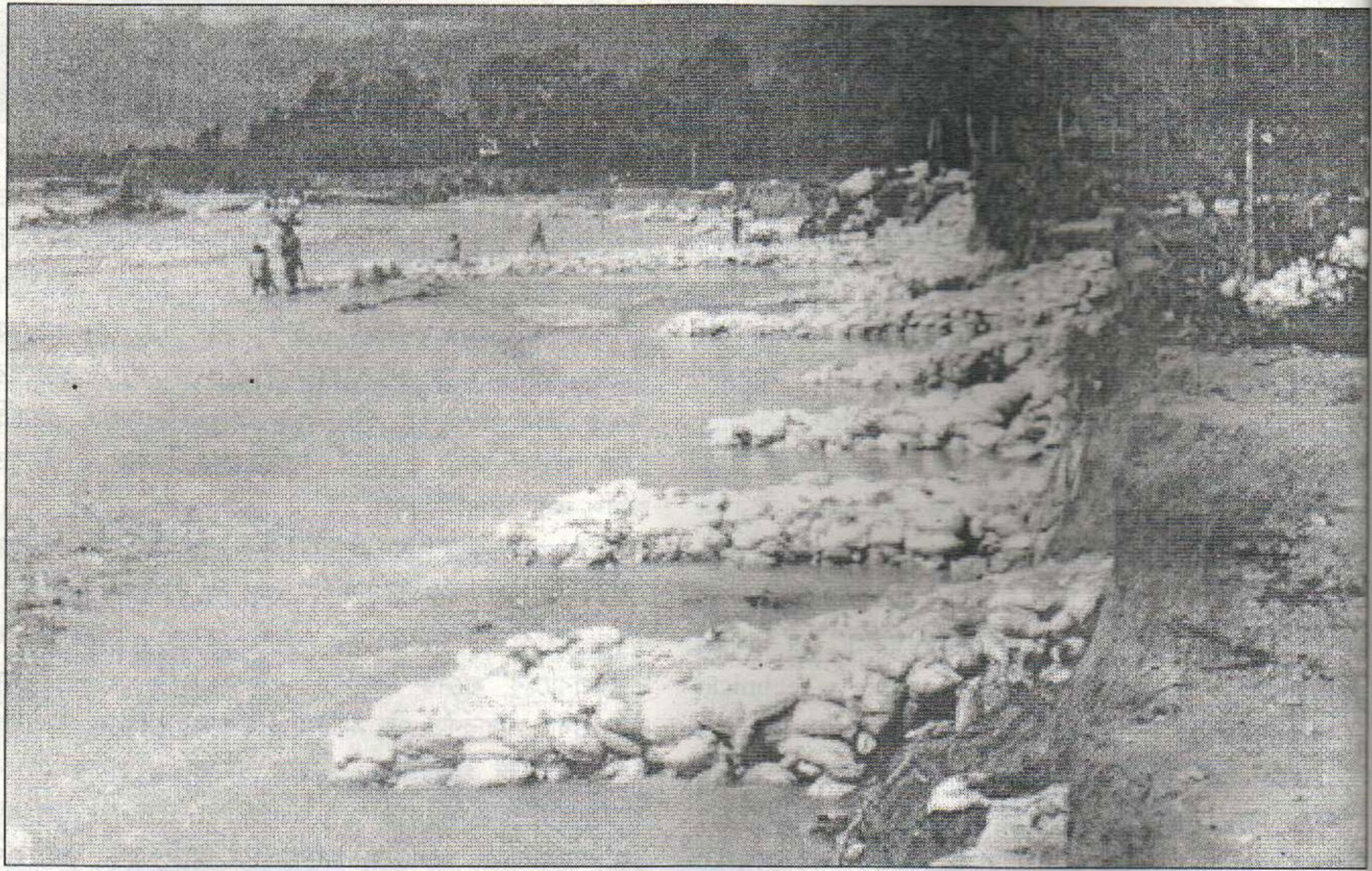

উত্তরবঙ্গের নদীতে বন্যা প্রতিরোধক কাজ

মুখবন্ধ

মহানন্দা নদী, দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং মহকুমার হিলি বনভূমি অঞ্চল ও তার সংলগ্ন সমান্তরাল ভূখণ্ড থেকে উদ্ভূত হয়ে সুক্না বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। হিলি অঞ্চলে নরম ও রূপান্তরিত শিলা গঠনের কারণে নদীপথ সহ নদী তলদেশে খুব বড়ো আকারে পলির আগমন ও আবর্জনা জমা হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যা কিনা নদী প্রবাহের সঙ্গে সমতলে নদীতলদেশে এসে জাঁকিয়ে বসে। এভাবেই নদীতলদেশ কোনো কোনো জায়গায় ক্রমাগত উঁচু হতে থাকে। তখন প্রকৃতপক্ষে নদীতলদেশের সঙ্গে সংলগ্ন ভূমিতলের কোনো পার্থক্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। একদা এই নদীর ডানপাড়ে, মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের মরা সুক্না হ্রদের প্রায় ১.৫ কিলোমিটার ভাটিতে এমনই এক স্থান লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে বিপরীত দিকের বাঁপ্রান্তে উঁচু পাহাড়ের অস্তিত্বের কারণে উক্ত অঞ্চল প্রচণ্ড স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে ও অত্যধিক বন্যার জল প্রবাহিত হওয়ার সময়ে নদীর ডানপাড় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ডানপাড়ের বাঁধ ভেঙে দেয়।

বর্তমান সমস্যা

উত্তরবঙ্গের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বিগত ২০০৩ সালের ৪ জুলাই থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত ওই সাতদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টিপাত হয়। ওই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। মোট পরিমাণ ছিল সাতদিনে ৭৪৪.৮০ মিমি। দিন অনুযায়ী শিলিগুড়িতে ওই সাতদিনের নথিভুক্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নীচের সারণিতে দেখানো হল :

তারিখ	বৃষ্টিপাত (মিমি)
৪.৭.২০০৩	২৪৩.৪০
৫.৭.২০০৩	৯১.০০
৬.৭.২০০৩	১২.২০
৭.৭.২০০৩	৯৪.৪০
৮.৭.২০০৩	৯৫.০০
৯.৭.২০০৩	১০১.৬০
১০.৭.২০০৩	১০৭.২০
মোট	৭৪৪.৮০

উত্তরবঙ্গের নদী : এমনিতে শান্ত, কিন্তু বন্যায় ভয়ংকর

একনাগাড়ে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের রুন মহানন্দা নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছিল। ধাবমান বন্যার জলের প্রবল তির জন্যে নদীর দক্ষিণ প্রান্তের াঁধে ফাটল ধরে এবং ভেঙে যায়। লে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের এক বস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়। এই াবনের জল জমির প্রাকৃতিক ঢাল নুযায়ী সংকীর্ণ পথ ধরে বেরিয়ে সে দুটি ছোটো নদীর মধ্যে প্রবেশ রে। এই নদী দুটির নাম পচানই ও মহিষমারী। উক্ত নদী দুটি মহানন্দা দীরই দুটি শাখা নদী। পচানই ও হিষমারী নদী দুটি শিলিগুড়ি পুরসভার হর ও আধা-শহর অঞ্চলের মধ্য িয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় মহানন্দা দীর ভাটিতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরসভার নিকাশি জল, উক্ত দী দুটির নিজস্ব জল ও মহানন্দা নদীর ল মিলিতভাবে এই নদী দুটি দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে নদী দুটি সবসময়ই জলে টইটুম্বুর থাকে ও তারই ফলে বিপত্তি ঘটে। ফলে শিলিগুড়ি পুরসভার একাংশ প্রায়ই জলমগ্ন হয়ে থাকে। এসময়ে কয়েকদিন ধরে গড়পড়তা ১ মিটার জলমগ্নতার ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় এবং সম্পত্তিহানির খবরও পাওয়া যায়।

দেখা গেছে, এই জলমগ্নতায় প্রায় ৮৫০০ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুকনা অঞ্চলে ১৫০টি কুঁড়ে ঘর ভেঙে পড়েছে ও শিলিগুড়ির উজানে ১৩০টি পাকা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৫০টির অবস্থা খুবই শোচনীয় ও ৪টি পাকা বাড়ি পচানই নদীর বাঁ-প্রান্তে এখনও ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে।

সমস্যা সমাধানে প্রস্তাব

এ ধরনের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে স্পর্শকাতর অঞ্চলে প্রায় ৯৫০ কিমি লম্বা মাটির বাঁধের পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। কারিগরি পরামর্শদাতা পর্ষদের (TAC) পরামর্শক্রমে নদীর ধারের ঢালে নতুন নির্মিত মাটির বাঁধটি উপযুক্তভাবে বোল্ডার সসেজ অ্যাপ্রন দ্বারা বাঁধিয়ে নদীগর্ভ পর্যন্ত প্রসারিত করার প্রস্তাব উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের (NBFCC) কাছে তাদের ৪২তম মিটিংয়ে রাখা হয়েছে। অবশ্য নদীকে তার চরে বেরোবার জায়গাও দেওয়া হয়েছে এই প্রস্তাবে।

রূপায়িত প্রকল্পের বাস্তবতা

প্রকল্পটি রূপায়িত হলে ওই অঞ্চলের মূল্যবান বাস্তুজমি, বনাঞ্চল, কৃষিজমি, নদী সম্পর্কিত কাজ ও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সম্পদের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হবে। কেবল তাই নয়, এ প্রকল্প রূপায়ণে কিছুটা হলেও শিলিগুড়ি পুরসভা অঞ্চলের বাসিন্দাদের, মহিষমারী ও পচানই নদী দুটির মাধ্যমে মহানন্দা নদীর ঝলকা বানের দুঃস্বপ্ন থেকে স্বস্তি এনে দেবে।

লেখক : নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

উন্নয়ন

ভাগীরথীর ভাঙন প্রতিরোধে বর্ধমান সেচ ভুক্তির ভূমিকা

দীপককুমার মুখার্জি

পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম নদী অববাহিকা গঙ্গা-ভাগীরথী নদী অববাহিকা ২০টি উপ-অববাহিকার সমন্বয়ে গঠিত। এই অববাহিকার আয়তন প্রায় ৭১,৬১৮ বর্গ কিমি যেখানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৮,৭৫২ বর্গ কিমি।

পশ্চিমবঙ্গের বস্তুগত সামগ্রিক উন্নয়নের যে দুটি মূল ক্ষেত্র অর্থাৎ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উন্নয়ন এই দুই ক্ষেত্রেই যে আঞ্চলিক অভিমুখ ক্রিয়াশীল তাহা এই অববাহিকার প্রত্যক্ষ প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত এবং এর উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আবার লোকসম্পদটি ঘনত্বের বিচারে গোটা দেশে এই রাজ্য প্রথম। এখানে প্রতি বর্গ কিমি এলাকায় ৯০৪ জন বাস করেন। দেশের মোট আয়তন ২.৭ শতাংশ জুড়ে এই রাজ্য : কিন্তু দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭.৮ শতাংশ মানুষ এখানে বাস করেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং নদী বাঁধ বা পাড়ের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নকেই সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে।

গঙ্গা-ভাগীরথী অববাহিকার ; বর্ধমান জেলার যে অংশ বর্তমান আলোচনায় আলোচ্য, তার প্রায় সমস্তটাই ছিল দামোদর ইরিগেশন সার্কেল-এর—দামোদর ক্যানেল ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত। বিগত ১৯৯৭-৯৮ সালে ; এই নদী অববাহিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কাটোয়া-১নং ব্লকের অন্তর্গত কালিকাপুর থেকে কালনা-২নং ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব-সাতগাছি পর্যন্ত, 'বর্ধমান ইরিগেশন ডিভিশন'-এর অধীনে আসে। এই ডিভিশনের একটি সাব-ডিভিশনে (যা চুঁচুড়ায় অবস্থিত ছিল বর্ধমান ইরিগেশন সাব ডিভিশন নং-iv), গঙ্গা-ভাগীরথীর আলোচ্য অংশটি সংযোজিত হয়। বর্তমানে এই সাব-ডিভিশনাল অফিসটি কালনায় অবস্থিত। সংযোজিত এলাকার বিবরণ নিম্নরূপ :

সারণি-১

নদীর নাম	বাঁধের অবস্থান	বাঁধের দৈর্ঘ্য	মন্তব্য
ভাগীরথী	আটপাড়া	১৬৫০ মিটার	বর্ধমান সেচভুক্তির অন্তর্গত নদী বাঁধের তালিকা অনুসারে।
	ঘুনি	১০০০ "	
	দামপাল	৪০০ "	
	সাজিয়াড়া	২১৬০ "	
	ভোলাডাঙা তামাঘাটা	৬৬০ "	
খড়ি	সোনাকুড়ি	৪৪০ "	
	আকুপাড়া	৬৬০ "	
	সাতপোতা	১০০০ "	

নদী অববাহিকার বিবরণ

কাটোয়া-১নং ব্লকের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকের সামান্য অংশ, পূর্বস্থলী-১নং এবং পূর্বস্থলী-২নং ব্লকের সিংহভাগ অর্থাৎ উত্তরে খড়ি নদীর কিছু অংশ ; দক্ষিণে সমুদ্রগড় পর্যন্ত, কালনা-১নং ও কালনা-২নং ব্লকের ধাত্রিগ্রাম, পিয়ারীনগর, কালনা শহর এবং হুগলি জেলার সীমানায় অবস্থিত পূর্ব-সাতগাছি পর্যন্ত নদী বাঁধের বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

গুরুত্ব :

বর্ধমান ইরিগেশন ডিভিশনের এলাকার মধ্যে রয়েছে অম্বিকা-কালনা। যার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। রাজা লক্ষণসেনের আমলে নির্মিত মন্দির এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছে। ত্রিমঠ শ্যামরায়ের মন্দির-এর গায়ের শিলালিপিতে লেখা আছে শকাব্দ ১০৪৬ ইং ১১২৪ খৃঃ যা রাজা লক্ষণসেনের রাজত্বের সময়কালকে নির্দেশ করে। অম্বিকা-কালনা গঙ্গার তীরবর্তী বর্ধমান রাজের প্রাচীন নদী বন্দর ছিল। Rev. James Long তাঁর "On the banks of Bhagirathi (Calcutta Review-1846)" গ্রন্থে বলেছেন "Kalna is noted for its great trade, being the part of Burdwan District, the Baagar has 1000 shops, the houses are chiefly of bricks."

বর্ধমানের মহারাজাদের সময়কালে নির্মিত বহু মন্দির অম্বিকা-কালনায় আছে। যার মধ্যে মহারাজ তেজচাঁদ নির্মিত রাজবাড়ির দক্ষিণ দরজার মুখোমুখি ১১০ চূড়া বিশিষ্ট নবকৈলাশ মন্দির জাতীয় সৌধের মর্যাদা পেয়ে বর্তমানে পুরাতত্ত্ব বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণে এবং পশ্চিমবঙ্গ

পর্যটন মানচিত্রে অম্বিকা কালনার নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এই মন্দির সম্পর্কে District Gazetteer (J.C.K.P.)তে উল্লেখ আছে :— "The Maharaja still keeps up a palace here and near it a series of 109 Sivalingam..... It is said to have special efficacy in averting certain dangers such as social degradation, loss of caste, extinction of one race and fatal disease."

(Gazetteer–J.C.K.P. Page-197)

বিগত কয়েক দশক সময়কালে গঙ্গা-পদ্মা বা ভাগীরথী-হুগলি নদীর কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাটোয়ার পর থেকে পূর্ব সাতগাছি (মেদগাছি) পর্যন্ত যে সমস্ত নদী ভাগীরথীতে মিশেছে যেগুলি (১) জলঙ্গী নদী মিশেছে নবদ্বীপের কাছে বাম পাড়ে (L/B)। (২) খড়ি নদী মিশেছে কালনা ১নং ব্লকের মালতীপুর ঘাটের ওপরে দক্ষিণ পাড়ে (R/B)। এছাড়া আছে পদ্মবিল যার জল বহন ক্ষমতা কম। কিন্তু কাটোয়ার ওপরে বেশ কিছু নদী গঙ্গায় এসে মিশেছে এবং ওই নদীগুলি প্রচুর পলি বহন করে এনে গঙ্গাবক্ষে ফেলছে। এই নদীগুলির ভিতর অজয় নদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ এই নদীর ওপর কোনও বাঁধ না থাকায় (Uncontrolled) এর মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ পলি জলবাহিত হয়ে আসে। এছাড়া গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে প্রবাহকালীন, নদীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গঙ্গা-ভাগীরথী নদীতেও Meandering effect দেখা যায়। এই ধরনের প্রবাহের জন্য নদী ; পাড় ঘেঁসে অর্থাৎ গভীর নদীখাতের দিকে প্রবাহিত হয়। যার ফলে এক পাড় ভাঙনের কবলে পড়ে এবং অন্যপাড়ের দিকে চর সৃষ্টি হয়।

বর্ধমান জেলায় গঙ্গা-ভাগীরথী নদীর ভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলি নিম্নরূপ :

গঙ্গা-ভাগীরথী নদীর ভাঙনপ্রবণ এলাকা (২০০২-'০৩)

থানার নাম	এলাকার নাম	কোন পাড়	ভাঙ্গনের দৈর্ঘ্য	বাৎসরিক ভাঙনের হার	মন্তব্য
কাটোয়া	অগ্রদ্বীপ	বামপাড়	১১০০ মিটার	১৩ মিটার	
পূর্বস্থলী	ঝাউডাঙা	বামপাড়	১১৫০ মিটার	২০.৮০ মিটার	
"	নারায়ণপুর সান্যালপাড়া	দক্ষিণপাড়	১০০০ মিটার	৮.০০ মিটার	
"	কুটুরিয়া	"	২৫০ মিটার	২০.০০ মিটার	
"	কাষ্ঠশালি	"	৫০০ মিটার	১৫.০০ মিটার	
"	তামাঘাটা	"	৫৫০ মিটার	১৫.০০ মিটার	Railway Dept. এর মাধ্যমে কাজ চলছে।
"	জালুইডাঙা	"	৭৫০ মিটার	২০.০০ মিটার	
"	নসরৎপুর	"	৩৫০ মিটার	১৫.০০ মিটার	
কালনা	পিয়ারীনগর	"	৬০০ মিটার	১২.০০ মিটার	
"	কালনা	"	২০০ মিটার	১০.০০ মিটার	আনুমানিক

কালনা শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সর্বশেষ ২০০২-০৩ আর্থিকবর্ষে কালনা শহরে "ছোট দেউরীর পুরাতন শিবমন্দির" বাঁচানোর জন্য ভাগীরথীর ৩৫ মি. লম্বা পাড়-এ বোল্ডার পিচিং করা হয়। এর জন্য খরচ হয় ৭৬,২৫৩/- টাকা। কালনায় সেচ দপ্তরের Gauge Station-এর নীচে খেয়াঘাট থেকে জাপট পর্যন্ত মূলনদী শহরের দিকে পাড় ঘেঁসে বইছে। এখানে ৩৫০ মি. বোল্ডার পিচিং করা গেছে।

বর্ধমান জেলায় ভাঙন প্রবণ এলাকাগুলির ভাঙন প্রতিরোধের জন্য '৯৭-'৯৮ সাল থেকেই স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঁচটি Scheme তৈরি করা হয়। এগুলি হল (১) ঝাউডাঙা (২) তামাঘাটা (৩) সিমলা (৪) কুটুরিয়া এবং (৫) কাষ্ঠশালি। এদের মধ্যে সিমলার পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়তা হারানোর ফলে পরিত্যক্ত হয়। বাকি চারটি Scheme ২০০৩-'০৪ সালের প্রথম দিকে নতুনভাবে তৈরি করা হয়। Field Survey-এর মাধ্যমে ওই জায়গাগুলিতে ভাগীরথীর প্রয়োজনীয় সংখ্যক Cross section এবং বর্তমান Bank Line নেওয়া হয়। কালনা Gauge Station থেকে বার্ষিক সর্বোচ্চ ডিসচার্জ ডাটা নিয়ে ২৫ বছরে Return period Flood নির্ণয় করা হয়। সর্বোচ্চ ডিসচার্জ ধরা হয় 5000 cumec। River Research Institute থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী Lacy's silt factor ধরা হয় 0.60। Scheme-এর Technical Note অনুসারে :

Normal Scour Dept (D_2) = $0.473 \left(5000/_{0.60}\right)^{1/3} = 0.60$ mtr.

Hence width of Launching Apron (1.5 DL)=1.50×9.60 = 14.40 mtr.

প্রথমে বাঁধের ঢালে H.F.L. পর্যন্ত 450 mm বোল্ডার পিচিং, বোল্ডারের তৈরি Launching Apron এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বোল্ডারের বেড বার এর পরিলকল্পনাসহ Scheme-গুলি 'কমিটি অফ চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার্স''-এর ৭৭তম সভায় অনুমোদনের জন্য দেওয়া হলে তাঁরা Launching Apron এবং Bed Bar-এর বদলে ১.০০ মি ব্যাস যুক্ত রাউণ্ড Sausage, ১৫.০০ মি লম্বা ৩.০০ মি c/c ব্যবহারের কথা বলেন। ওই পরামর্শমত Scheme-গুলি সংশোধন করা হলে সংশোধিত Scheme চারটি

সারণি-২

ক্রমিক সংখ্যা	Scheme-এর নাম	পাড় বাঁধাই
1.	Protection to the left bank of river Bhagirathi at Mouja Jhaudanga against erosion in P.S. Purbasthali under Burdwan Irrigation Sub Division No.-iv of Burdwan Irrigation Division.	1150.00 M.
2.	Do –Do– right bank of –Do-Do-at Mouja-Kuturia against –Do-Do-Do.	250.00 M
3.	Do–Do– right bank of –Do-Do-at Mouja Kasthasali against –Do-Do-Do.	500.00 M
4.	Do–Do– right bank of –Do-Do-at Mouja Tamaghata against –Do-Do-Do–.	550.00 M

'কমিটি অফ চিফ ইঞ্জিনীয়ার্স'-এর ৭৯তম সভায় (২৮ জুন, ২০০৪) অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ওগুলি ১৫ জুলাই, ২০০৪ 'Technical Committee of West Bengal Flood Control Board'-এর ১০২তম সভায় অনুমোদন লাভ করে এবং বর্তমানে 'Ganga Flood Control Commission-এর Approval-এর জন্য তাঁদের পাটনা অফিসে পাঠানো হয়েছে। G.F.C.C.-এর পরামর্শ অনুযায়ী Free Board level পর্যন্ত বোল্ডার পিচিং-এর ব্যবস্থা Scheme-এ সংযোজিত হয়েছে। এই অগ্রগতির জন্য কাটোয়া, পূর্বস্থলী P.S.-এর গঙ্গাভাঙনে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে।

বিগত আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০০৩-'০৪ সালে কালনা-১নং ব্লকের পিয়ারীনগর এবং পূর্বস্থলী ব্লকের অগ্রদ্বীপে ভাঙন প্রতিরোধের জন্য কিছু অস্থায়ী কাজ করা হয়। পিয়ারী-নগর-এ ভাগীরথী,কালনা—নবদ্বীপ রাস্তা (S.T.K.K. Road) থেকে মাত্র ৭৯.০০ মি দূরত্বে বইছিল। অগ্রদ্বীপে 'বেথুয়াডহরী-অগ্রদ্বীপ' রাস্তা থেকে মাত্র ৫৬.০০ মি. দূরত্বে বইছিল ভাগীরথী।

উভয়ক্ষেত্রেই বোল্ডার ভর্তি বাঁশের তৈরি Porcupine cage-এর সাহায্যে ১৫.০০ মি লম্বা Spur -২০.০০ মি. c/c তৈরি করা হয় এবং দুটি Spur-এর মধ্যবর্তী অংশে তিন সারি Deep trees ব্যবহার করে ওই অংশে ভাঙন প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টার সন্তোষজনক সাফল্য পিয়ারীনগর ঘাটে এবং আংশিক সাফল্য অগ্রদ্বীপে লক্ষ্য করা গেছে। Deep trees-এর সঙ্গে সমদূরত্বে তিনটি ৭৫০ মিমি. ব্যাসযুক্ত এবং ৭৫০ মিমি. উচ্চতার Circular Sausage বেঁধে Dump করা হয়। Spur এবং Deep trees u/s এর দিকে ১০° থেকে ২৫° হেলিয়ে (repelling spur) ফেলা হয়। ভবিষ্যতে এই দুটি জায়গায় স্থায়ী প্রোটেকশন ওয়ার্ক করা প্রয়োজন। (চিত্র-১) 'অগ্রদ্বীপ-বেথুয়াডহরী' রাস্তার ভাঙন প্রতিরোধে Porcupine Cage-এর ব্যবহার।

সারণি-৩

পিয়ারীনগর ও অগ্রদ্বীপে অস্থায়ী প্রোটেকশন ওয়ার্ক-এর তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	কাজের নাম
1.	Emergent palliative works along R/B of river Bhagirathi at Piyari Nagar Ghat of Krisnadebpur G. P. Kalna-1 under B.I. Sub-Divn. No.-iv Kalna during 2003-'04. Considered length = 200.00 M
2.	Emergent Palliative Works along L/B of river Bhagirathi at Agrodwip P.S. Katwa under B.I. Sub. Division No.-iv Kalna during 2003-'04. Considered Length = 800.00M

ভাগীরথীর ভাঙনে আক্রান্ত বাম পাড় (চিত্র-১)

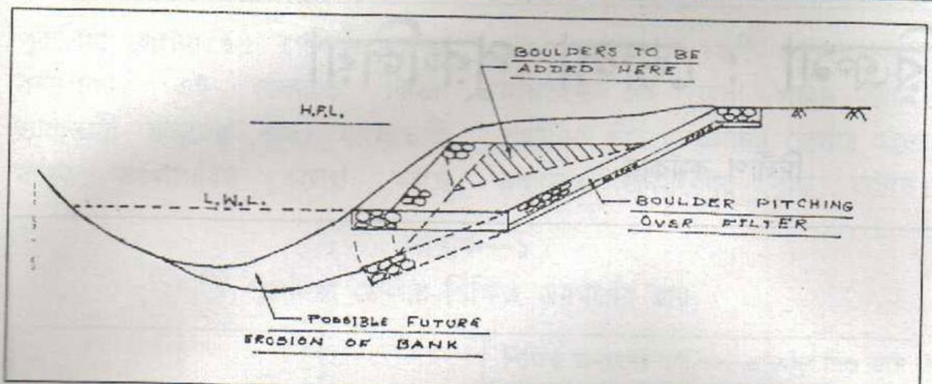

(চিত্র-২)

কাটোয়া থানার অগ্রদ্বীপে ভাঙন প্রতিরোধে Deep trees ফেলা হচ্ছে। (চিত্র-৩)

গঙ্গা-ভাগীরথী নদী ভাঙনের গুরুত্ব অনুধাবন করে ইংরাজি ২০০৩ সালের জুন মাসে একটি কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞদল বিভিন্ন ভাঙন স্থল পরিদর্শন করে। রাজ্য সরকারের তরফে একটি বিশেষজ্ঞদল উপরোক্ত দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শনের পর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 'বশিষ্ঠ কমিটি' যে সমস্ত স্থান চিহ্নিত করে, বর্ধমান ইরিগেশন ডিভিশনের আওতায় সেগুলি হল যথাক্রমে ঝাউডাঙা, কাষ্ঠশালী, কুটুরিয়া ও তামাঘাটা। এই প্রসঙ্গে বলা যায় সংক্ষিপ্ত পরিদর্শনকালে পূর্বস্থলী-২নং ব্লকের অন্তর্গত অগ্রদ্বীপের ভাঙন বিশেষজ্ঞদলের নজরে আনা যায়নি। ভাঙনের তীব্রতার নিরিখে অগ্রদ্বীপের অবস্থা ওই চারটি স্থানের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। অবিলম্বে ভাঙনরোধের কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে না পারলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হতে পারে এবং অগ্রদ্বীপ গ্রামটির একটি দ্বীপের আকারে অবস্থান করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ভাঙন রোধের জন্য একটি Scheme তৈরি করে কমিটি অফ চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার্স-এর ৭৯তম সভায় (ইং ২৮ জুন, ২০০৪) জমা দেওয়া হয়। ওই কমিটি আরও কিছু তথ্য সংযোগ করতে বলায় বর্তমানে জরিপের কাজ চলছে। এই Scheme-এ Low Water Level-এ Apron সহ নদীর দিকের ঢালে Boulder Pitching ধরা আছে। Submersible Bed Bar-এর তলদেশ ধীরে ধীরে বসে গেলে Nose-এর উপরিভাগে প্রয়োজনমতো বোল্ডার সংযোজন করতে হবে। সর্বাধিক গভীরতায় পৌঁছালে আর পাথর সংযোগ করতে হবে না। এর জন্য কয়েক বছর Maintenance করতে হবে, কেবলমাত্র Bed Bar-গুলি। এই ব্যবস্থায় Bed Bar-গুলির অন্তর্বর্তী অংশে নদীর পলি জমার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল।

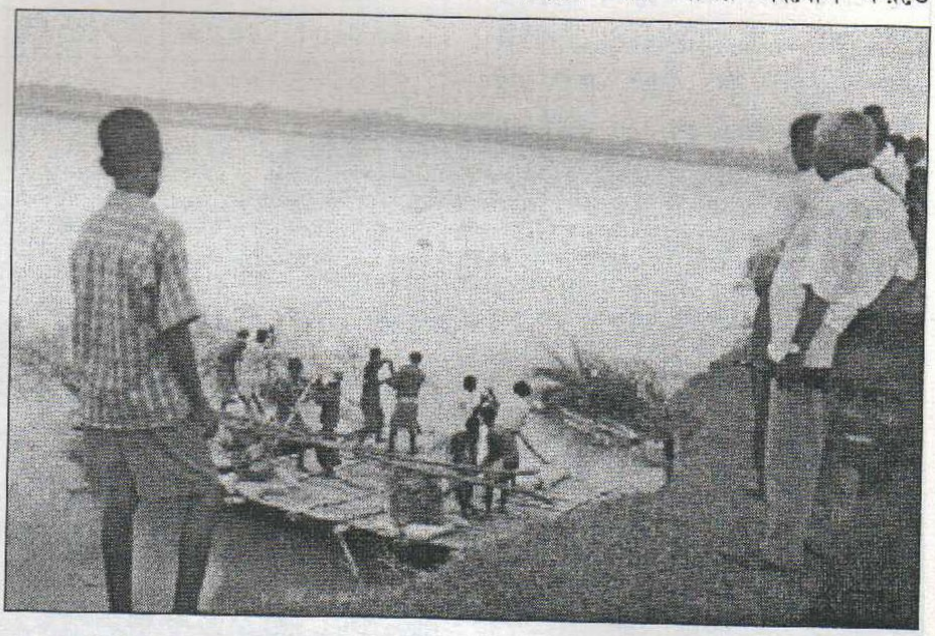

কাটোয়া থানার অগ্রদ্বীপ মৌজায় ভাগীরথীর বাম পাড়ের ভাঙন প্রতিরোধক কাজ (চিত্র-৩)

লেখক : *অবর সহ বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর*

লেখা পাঠাবার জন্য আবেদন

সেচপত্র পত্রিকাটি সেচ ও জলপথ দপ্তরের সেচব্যবস্থা, নিকাশিব্যবস্থা ও বন্যানিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি মুখপত্র। প্রকাশের দিন থেকেই এই পত্রিকা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এমন একটি পত্রিকার জন্য, উক্ত বিষয়গুলির উপর সেচ বিভাগ ও দপ্তরের সবার কাছে লেখা আহ্বান করছি ; সঙ্গে উপযুক্ত ছবি। সংক্ষিপ্ত সংবাদের স্বার্থে শীঘ্র ক্যাপশন-সহ ছবি পাঠান।

প্রধান সম্পাদক
সেচপত্র

সেচ পরিক্রমা : জেলা পুরুলিয়া

দিলীপ কর্মকার

চড়াই-উতরাই, পাহাড়-টিলা ও রুক্ষ-শুষ্ক ল্যাটেরাইটযুক্ত মাটি নিয়েই গঠিত জেলা পুরুলিয়া

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের শেষ পশ্চিম অংশে অবস্থান পুরুলিয়া জেলার। এই জেলার পাশে ঝাড়খন্ড রাজ্যের সীমানা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় এই জেলা বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য বিহার রাজ্য পরবর্তীকালে বিভাজনের মধ্য দিয়ে ঝাড়খন্ড রাজ্যের গঠন। সেই সময় সমগ্র অঞ্চলটি ছিল মানভূম অঞ্চল। একধারে ধানবাদ অপর ধারে পুরুলিয়া, যার মাঝে দামোদর। সে সময় এই পুরুলিয়া অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ ছিল বাংলাভাষী, হিন্দিভাষী ছিল কম। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, জনজীবনের চাহিদা পূরণে এবং বাংলার চাষবাসের উন্নতির জন্য কংসাবতী জলাধার প্রকল্প তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কাজ শুরুর সময়ে এই কংসাবতী (কাঁসাই) নদীর কিছুটা অংশ এই পুরুলিয়া জেলাতেই অবস্থানের ফলে, পুরুলিয়াকে পশ্চিমবঙ্গের আয়ত্তাধীন করার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরে ১৯৫৬ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিতে ১ নভেম্বর এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের শাসনাধীনে আসে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে পাকাপাকি চিত্রায়িত হয় পুরুলিয়া জেলা।

ছোটো পাহাড়, টিলা এই জেলাতে অনেক দন্ডায়মান। জমি ও চড়াই-উতরাই লাল মাটির। রুক্ষ, শুষ্ক ল্যাটেরাইটযুক্ত, যা চাষের পক্ষে অনুর্বর। এখানকার আবহাওয়া গ্রীষ্মকালে অতি গরম, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। সঠিক সময়ে মরসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত শুরু না হলে খরার প্রবণতা দেখা দেয়। আবার শীতের মরসুমে প্রচন্ড শীত। বৃষ্টিপাত এই জেলাতে স্বল্প। জেলার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৮০০ মিমি থেকে ১০০০ মিমি। এতদসত্ত্বেও এই জেলাকে সামান্য বন্যাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলায় ৬৫ বর্গকিমি এলাকা বন্যাপ্রবণ। এই জেলাতে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাস। বাংলাভাষী মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও আছে সাঁওতালি, মুনদারী, কুরমালী, হিন্দি, উর্দু ভাষাভাষি মানুষজন। তপসিলি ও তপসিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন এই জেলাতে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা নিয়েছে। শিক্ষায় এই জেলা যুগানুপাতে এগিয়ে চলেছে। পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় ১৯৮১ সালে শিক্ষিত জনগণের হার থেকে ২০০১ সালে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২৩ শতাংশ। (সারণি—১)

সারণি—১
পুরুলিয়া জেলার শিক্ষিত জনগণের হার

জেলা	বৎসর	জনসংখ্যার	শিক্ষিত জনগণের হার, ০—৬ বৎসর শিশু বাদে		
			মোট সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
পুরুলিয়া	১৯৮১	১৮৫৩৮০১	৩৩.৬৭	৫১.৩১	১৫.০৯
	১৯৯১	২২২৪৫৭৭	৪৩.২৯	৬২.১৭	২৩.২৪
	২০০১	২৫৩৫২৩৩	৫৬.১৪	৭৪.১৮	৩৭.১৫

প্রাকৃতিক সম্পদও এই জেলাতে কম নয়। কয়লা, তামা, লাইমস্টোন, গ্র্যানেট, গ্রাফাইট, মাইকা, লৌহ আকরিক, বিল্ডিং মেটিরিয়াল, ফায়ার-ক্লে, মোলডিং-এর বালি, জেমস্টোন, অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে হলেও সোনা ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ এই জেলা। সমৃদ্ধ শাল, শিমূল ও মহুয়া গাছে। এখানে আছে জঙ্গল এলাকা। জেলাতে আছে অযোধ্যা, গোলজ, গোরগাকুন্ড্র বাগমুন্ডি, দলমা ও পাঞ্চেতের মতো ছোটো পাহাড়। এই ছোট পাহাড় আবৃত ভূমি ভেদ করে বইছে অনেক ছোটো ছোটো নদী, ঝোড়া। এখানে আছে হ্রদ। এই জেলাতেই অবস্থান কুমারী, কাঁসাই, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, গোবাই, শীলাবতী ইত্যাদি নদ। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সুবর্ণরেখা নদী।

আয়তনে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের প্রায় ৭.০৫ শতাংশ। ১৯টি জেলার মধ্যে আয়তনে এই জেলা পঞ্চম স্থানে। স্বাভাবিক নিয়মে অন্যান্য জেলার মতো এখানেও জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। (সারণি—২) জেলার জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩.১৬ শতাংশ। ১৯৬১ সালে জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার লোকসংখ্যা ছিল ১৩.৬০ লক্ষ এবং সর্বশেষ ২০০১ সালে জনগণনা অনুসারে লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫.৩৫ লক্ষ। এই বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদনে চাষের পক্ষে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন তা এই জেলাতে ঘাটতি দেখা যায়। এখানকার ছোটোবড়ো ঝোড়াই ছিল জলের উৎস। ফলে পূর্বে খরা ছিল এখানকার জনজীবনের নিত্যসঙ্গী।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আওতাধীন হবার পরবর্তীকালে পুরুলিয়া জেলার অনাবাদি জমি আবাদি জমিতে পরিণত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জনগণের খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে চাষবাসের প্রয়োজনে আবশ্যক হয়ে পড়ে সেচের জল। এই সেচের জলের জন্য সেচ ও জলপথ দপ্তর একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করে জেলার সবুজায়নের লক্ষ্যে। ১৯৯১-এর জনগণনা অনুযায়ী জেলার মোট পুরুষ শ্রমিককের ২৫ শতাংশ চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত। বাকিরা অন্যান্য কাজে যুক্ত আছে। কাজেই জেলাতে চাষের এলাকা বৃদ্ধির জন্য এবং অধিক ফলনের নিরিখে এ পর্যন্ত ৩২টি সেচ প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ২৩টি সেচ প্রকল্পের কাজ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করা হয়েছে। বাকি ৯টি সেচ প্রকল্পের কাজ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। (সারণি—৩) পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে এই প্রকল্পগুলির রূপায়ণ হয়েছে। এই জেলার ঝোড়াসমূহই জলের উৎস তাই সেইসব ছোটবড় ঝোড়ার জলকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে বাঁধ নির্মিত করেই তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন জলাধার। সারা বছরের বৃষ্টির জল ও ঝোড়ার জল সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে নির্মিত জলাধারগুলিতে। এলাকার চাষের সময় চাহিদাক্রমে প্রকল্পের খালসমূহের মাধ্যমে জলের যোগান দেওয়া হয়ে থাকে চাষের জমিতে। যে সমস্ত খাল কাটা হয়েছে তার দৈর্ঘ্যও জেলাতে কম নয়। (সারণি—৪) খালের মাধ্যমে জল সরবরাহ করার সময় জলের যাতে অপচয় না হয়, সেই লক্ষ্যে পরিকল্পনা রূপায়ণের সময়ই বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সেচ প্রকল্পগুলির

সারণি—২
পুরুলিয়া জেলার জনসংখ্যা

জেলা	জেলার আয়তন (বর্গ কিমি)	বৎসর	জনসংখ্যা			প্রতি বর্গ কিমি-তে জনসংখ্যা
			মোট সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	
পুরুলিয়া	৬২৩৪.১০	১৯৬১	১৩৬০০১৬	৬৮৯৩৫১	৬৭০৬৬৫	২১৮
		১৯৭১	১৬০২৮৭৫	৮১৬৫৪৪	৭৮৬৩৩১	২৫৭
	৬২৫৯	১৯৮১	১৮৫৩৮০১	৯৪৭১৯৫	৯০৬৬০৬	২৯৬
		১৯৯১	২২২৪৫৭৭	১১৪২৭৭১	১০৮১৮০৬	৩৫৫
		২০০১	২৫৩৫২৩৩	১২৯৮০৭৯	১২৩৭১৫৪	৪০৫

সারণি—৩
পুরুলিয়া জেলার সেচ প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক সংখ্যা	সেচ প্রকল্পের নাম	থানার নাম	জলগ্রহ ক্ষেত্রের আয়তন (বর্গ কিমি)	বাঁধের নমুনা	প্রকল্পের আকার
০১	সাহারাজোড় সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৪২.৮৮	মাটির বাঁধ-স্পিল-ওয়ে	মাঝারি
০২	রূপাই সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৫১.২০	—ঐ—	ক্ষুদ্র
০৩	বুড়িডুমুর সেচ প্রকল্প	আড়ষা	৩.২০	—ঐ—	ক্ষুদ্র
০৪	কাঁসাই সেচ প্রকল্প	ঝালদা	১৭.৯২	উইয়্যার (weir) কপাটবিহীন	ক্ষুদ্র
০৫	ফকিডি সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৯.৩২	—ঐ—	ক্ষুদ্র
০৬	বান্দাজোড় সেচ প্রকল্প	রঘুনাথপুর	১৬.৬৯	—ঐ—	ক্ষুদ্র
০৭	ডাংরা সেচ প্রকল্প	কাশিপুর	২২.৩২	মাটির বাঁধ-স্পিল-ওয়ে	ক্ষুদ্র
০৮	মাজরা সেচ প্রকল্প	কাশিপুর	২১.৭১	—ঐ—	ক্ষুদ্র
০৯	তারা সেচ প্রকল্প	পুরুলিয়া	২৭.৫২	উইয়্যার (weir) কপাটবিহীন	ক্ষুদ্র
১০	ফুলজোড় সেচ প্রকল্প	আড়ষা	৩.৮৪	—ঐ—	ক্ষুদ্র
১১	বান্দু সেচ প্রকল্প	আড়ষা	১০২.১৪	—ঐ—	মাঝারি
১২	কুমারী সেচ প্রকল্প	বলরামপুর	৯৪.৭২	মাটির বাঁধ-স্পিল-ওয়ে	মাঝারি
১৩	শঙ্খ সেচ প্রকল্প	বলরামপুর	৩৭.৫০	উইয়্যার (weir) কপাটবিহীন	ক্ষুদ্র
১৪	কেষ্টবাজার সেচ প্রকল্প	বাগমুন্ডি	১৬.৬৪	মাটির বাঁধ-স্পিল-ওয়ে	ক্ষুদ্র
১৫	কুলবেরা সেচ প্রকল্প	বাগমুন্ডি	২০.৪৮	—ঐ—	ক্ষুদ্র
১৬	কারিয়র সেচ প্রকল্প	ঝালদা	১৬.৩৮	—ঐ—	ক্ষুদ্র
১৭	ডিমু সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৮.১৯	—ঐ—	ক্ষুদ্র
১৮	পারগা সেচ প্রকল্প	ঝালদা	১৭.৭৯	—ঐ—	ক্ষুদ্র
১৯	তারাগোনিয়া সেচ প্রকল্প	পারা	২১.৮১	—ঐ—	ক্ষুদ্র
২০	লিপানিয়াজোড় সেচ প্রকল্প	পারা	২৮.১৬	—ঐ—	ক্ষুদ্র
২১	মৌতোড়জোড় সেচ প্রকল্প	রঘুনাথপুর	২৬.৬২	—ঐ—	ক্ষুদ্র
২২	রামচন্দ্রপুর সেচ প্রকল্প	সাঁতুড়ি	৩৬.৪৮	—ঐ—	মাঝারি
২৩	বেকো সেচ প্রকল্প	কাশিপুর	৪০.৪৫	—ঐ—	ক্ষুদ্র
২৪	ফুটিয়ারি সেচ প্রকল্প	হুড়া	২০.২২	—ঐ—	ক্ষুদ্র
২৫	পাতলোই সেচ প্রকল্প	হুড়া	৩৭.১২	—ঐ—	ক্ষুদ্র
২৬	গোলমারাজোড় সেচ প্রকল্প	পুরুলিয়া	১৯.২০	—ঐ—	ক্ষুদ্র
২৭	তুরগা সেচ প্রকল্প	বাগমুন্ডি	১৩.৫৭	—ঐ—	ক্ষুদ্র
২৮	কয়রাবেড়া সেচ প্রকল্প	বাগমুন্ডি	১৬.৭২	—ঐ—	ক্ষুদ্র
২৯	আপার বান্দু সেচ প্রকল্প	আড়ষা	১৩.৬৯	—ঐ—	ক্ষুদ্র
৩০	হনুমাতা সেচ প্রকল্প	বলরামপুর	৫৫.৫৫	—ঐ—	মাঝারি
৩১	বরাভূম সেচ প্রকল্প	বরাবাজার	১০২.৮১	—ঐ—	মাঝারি
৩২	টটকো সেচ প্রকল্প	বান্দোয়ান	১৮৯.৪৪	—ঐ—	মাঝারি

সারণি—৪

পুরুলিয়া সেচ প্রকল্পাধীন খালসমূহ

ক্রমিক সংখ্যা	সেচ প্রকল্পের নাম	থানার নাম	প্রধান খালের দৈর্ঘ্য		শাখা, প্রশাখা খালসমূহের দৈর্ঘ্য	
			প্রকল্প অনুযায়ী (কিমি)	সম্পাদন হয়েছে (কিমি)	প্রকল্প অনুযায়ী কিমি	সম্পাদন হয়েছে (কিমি)
০১	সাহারাজোড় সেচ প্রকল্প	ঝালদা	১১.৬১৬	১১.৬১৬	৩৮.৩২৮	৩৮.৩২৮
০২	রূপাই সেচ প্রকল্প	ঝালদা	১২.৭৭	১১.২৪	১১.৮৮৭	১১.৮৮৭
০৩	বুড়িডুমুর সেচ প্রকল্প	আড়ষা	২.৩৩	২.৩৩	—	—
০৪	কাঁসাই সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৩.০৭	৩.০৭	১.০৩	১.০৩
০৫	ফকিডি সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৪.০৮	৩.৮১	১.৩১	১.০৪
০৬	বান্দাজোড় সেচ প্রকল্প	রঘুনাথপুর	৭.৩০	৭.৩০	০.৫০	০.৫০
০৭	ডাংরা সেচ প্রকল্প	কাশিপুর	১৪.৮৫	১৪.৮৫	৯.৩১	৮.৬১
০৮	মাজরা সেচ প্রকল্প	কাশিপুর	৭.০০	৭.০০	—	—
০৯	তারা সেচ প্রকল্প	পুরুলিয়া	৪.৩২	৪.৩২	১২.০৩	১২.০৩
১০	ফুলজোড় সেচ প্রকল্প	আড়ষা	৫.০০	৫.০০	—	—
১১	বান্দু সেচ প্রকল্প	আড়ষা	১৬.৪৬	১৬.৪৬	১৭.৫০	১৭.৫০
১২	কুমারী সেচ প্রকল্প	বলরামপুর	৩৭.০০	৩৭.০০	২৪.০০	২৪.০০
১৩	শঙ্খ সেচ প্রকল্প	বলরামপুর	৪.১৭	৩.৮১	—	—
১৪	কেষ্টবাজার সেচ প্রকল্প	বাগমুন্ডি	৫.১৭	৪.৫৭২	৪.৩৭	৩.৫৬
১৫	কুলবেরা সেচ প্রকল্প	বাগমুন্ডি	৪.৯১	৪.৫৭২	৪.৩৭	৩.৫৬
১৬	কারিয়র সেচ প্রকল্প	ঝালদা	১১.২২	১১.২২	১.৯৫	১.৯৫
১৭	ডিমু সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৫.৬৪	৫.৬৪	৪.২৪	৪.২৪
১৮	পারগা সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৯.৪৫	৯.৪৫	৯.২০	৯.২০
১৯	তারাগোনিয়া সেচ প্রকল্প	পারা	১৪.৫২	১৪.৫২	১৬.১৩	১৬.১৩
২০	লিপানিয়াজোড় সেচ প্রকল্প	পারা	৯.৯০	৯.৯০	২২.৩২	২২.৩২
২১	মৌতোড়জোড় সেচ প্রকল্প	রঘুনাথপুর	১০.৭০	১০.৭০	৯.৮০	৯.৮০
২২	রামচন্দ্রপুর সেচ প্রকল্প	সাঁতুড়ি	১১.০৩	১১.০৩	৬.১৬	৬.১৬
২৩	বেকো সেচ প্রকল্প	কাশিপুর	১৫.৭৫	১৩.১২	৭.৫৭	১.৩০
২৪	ফুটিয়ারি সেচ প্রকল্প	হুড়া	১৩.৬৫৫	১.০৩	—	—
২৫	পাতলোই সেচ প্রকল্প	হুড়া	৪৫.২০	২৯.০০	—	—
২৬	গোলমারাজোড় সেচ প্রকল্প	পুরুলিয়া	১৪.৮০	১৩.৮৯	৭.৬০	৩.৬০
২৭	তুরগা সেচ প্রকল্প	বাগমুন্ডি	১১.০০	১১.০০	৫.৩০	৫.২০
২৮	কয়রাবেড়া সেচ প্রকল্প	বাগমুন্ডি	৩.০৪	২.৫০	৭.৬০	৩.০২
২৯	আপার বান্দু সেচ প্রকল্প	আড়ষা	৪.৩৯	৪.১৯	২.৩২	—
৩০	হনুমাতা সেচ প্রকল্প	বলরামপুর	২০.৩৬	২০.১১৫	১৫.৭২	১৫.৫৮৫
৩১	বরাভূম সেচ প্রকল্প	বরাবাজার	১৭.৬৪	১৭.৬৪	৮.৯০	৮.৯০
৩২	টটকো সেচ প্রকল্প	বান্দোয়ান	৪৫.৯০	৩৭.৮৫	৩০.০৫	২.৮৭৮

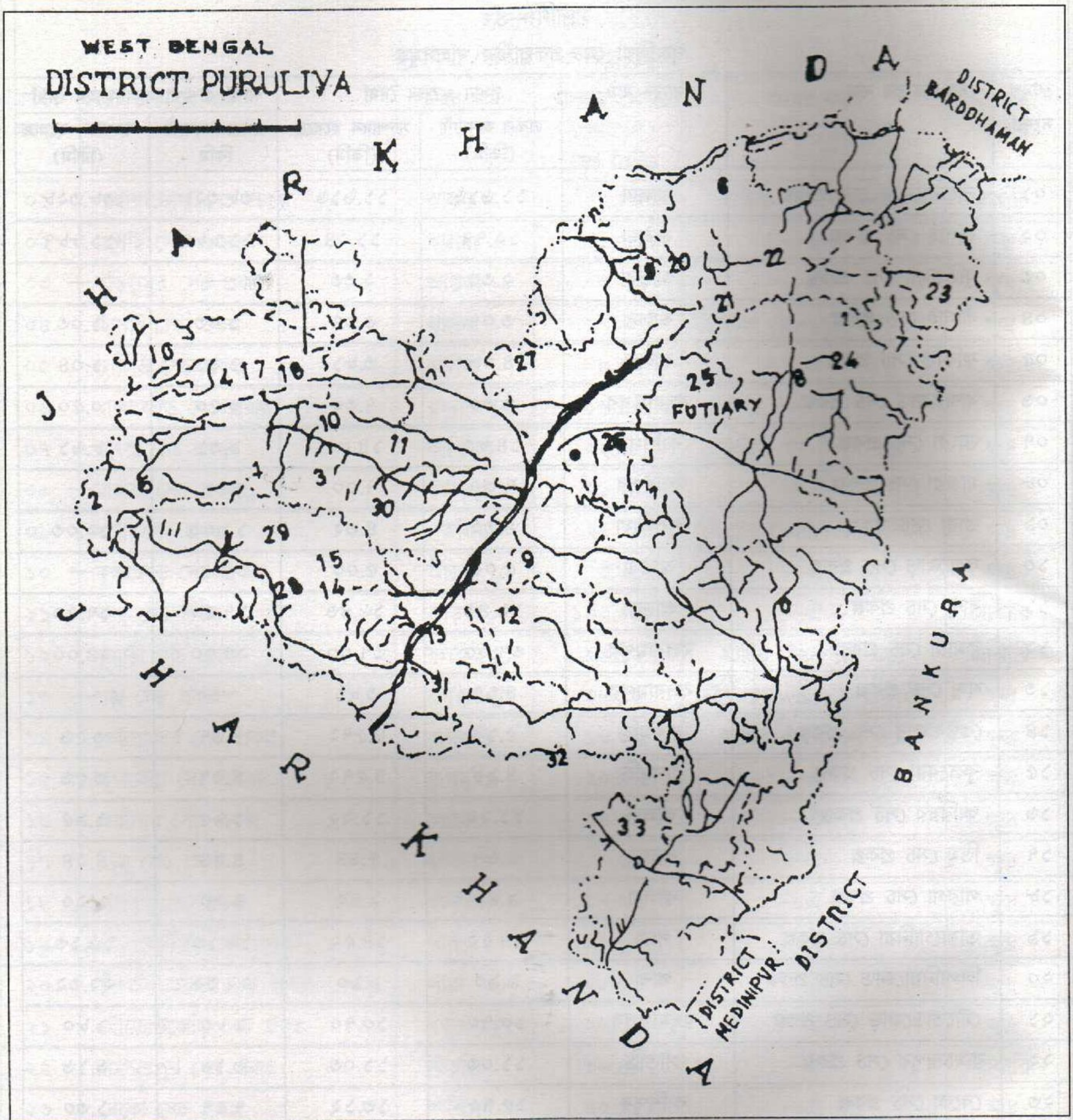

রূপায়ণের মধ্য দিয়ে যেমন শুখা মরসুমেও হচ্ছে চাষবাস, তেমনি অনেক অনাবাদি জমিকেও রূপান্তর করা গেছে আবাদি জমিতে।

জেলার মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী এখানে আমন ধান, আউস ধান, আলু, আখ, গম, তৈলবীজ, পাট ইত্যাদির চাষ হয়ে থাকে। কিছু কিছু জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়। এই জেলাতে দেখা মেলে মুকুন্দ, কদবেল, কুসুম, কদম, কেন্দু, গামার, বট, পলাশ ফুল ইত্যাদি গাছের। এছাড়া বেশকিছু ঔষধি গাছেরও চাষ হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্পগুলি নির্মাণের সময় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল নির্দিষ্ট এলাকাকে সেচসেবিত এলাকাতে পরিণত করার লক্ষ্যে। নির্ধারিত হয়েছিল ওই এলাকাতে খারিফ ও রবি চাষ করার জন্যে, ধাপে ধাপে সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়ে চলেছে প্রকল্পগুলি সম্পন্ন হবার মধ্য দিয়ে। এ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮০ শতাংশ জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা গেছে। (সারণি—৫) বাকি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবার মধ্য দিয়ে সঠিক লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আরও কিছু নতুন সেচপ্রকল্প তৈরির খসড়া রয়েছে, যার মাধ্যমে জেলার আরও বেশ কিছু এলাকাকে সেচসেবিত এলাকায় অন্তর্ভূক্ত করে জেলাকে

সারণি—৫

প্রকল্পগুলির সেচসেবিত এলাকার লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সেচসেবিত এলাকা

ক্রমিক সংখ্যা	সেচ প্রকল্পের নাম	থানার নাম	সেচসেবিত এলাকার লক্ষ্যমাত্রা [হেক্টর]		অর্জিত সেচসেবিত এলাকা [হেক্টর]	
			খরিফ	রবি	খরিফ	রবি
০১	সাহারাজোড় সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৫০৬৮	৭৪০.৬	৪৫৯৪	৬০৭
০২	রূপাই সেচ প্রকল্প	ঝালদা	১৮০০	১৫৬	১৬৯৯	১৫২
০৩	বুড়িডুমুর সেচ প্রকল্প	আড়ষা	৮৯	১১.৭২	৫৫	১৬
০৪	কাঁসাই সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৩২৪	—	১০১	—
০৫	ফকিডি সেচ প্রকল্প	ঝালদা	২৪২.৮১৬	—	২৭৫.১৯২	৮
০৬	বান্দাজোড় সেচ প্রকল্প	রঘুনাথপুর	৪০৫	৫০	২১২	২০
০৭	ডাংরা সেচ প্রকল্প	কাশিপুর	১০১২	১৪২	৮১০	১২৫
০৮	মাজরা সেচ প্রকল্প	কাশিপুর	৩০৩.৫২	৩৫	৩০৫	৩২
০৯	তারা সেচ প্রকল্প	পুরুলিয়া	৪৮৬	১৪১.৭	৪২৫	১০
১০	ফুলজোড় সেচ প্রকল্প	আড়ষা	১৬২	২০	২২০	১৫
১১	বান্দু সেচ প্রকল্প	আড়ষা	২২২৬	৪৮৫.৬৩	২৪৭০	৪৮৬
১২	কুমারী সেচ প্রকল্প	বলরামপুর	৩৬৪২	৪৩২	৩২৫৫	৩২০
১৩	শঙ্খ সেচ প্রকল্প	বলরামপুর	২৫৯.০০৪	৩০.৩৬	৩২৩.৭৫৬	৩০
১৪	কেষ্টবাজার সেচ প্রকল্প	বাগমুন্ডি	৬৭৮.৯৮১	৭০.৭২	৭০৮.২১৫	৫৬
১৫	কুলবেরা সেচ প্রকল্প	বাগমুন্ডি	৬০৭.০৪২	৪০.৪৮	৮০৯.৩৮৯	৫০
১৬	কারিয়র সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৪৮০	৩৮.৮৫	৩০৪	১৫
১৭	ডিমু সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৫৩০	৬৭.৭৬	৫৩০	৬০
১৮	পারগা সেচ প্রকল্প	ঝালদা	৭২৫	১৫৭.৪	৫৮০	২৫০
১৯	তারাগোনিয়া সেচ প্রকল্প	পারা	৭৬৯	১৩৭.৫৯	৭৬৯	১৮৮
২০	লিপানিয়াজোড় সেচ প্রকল্প	পারা	১২৮৫	৩২৯.৮২	১২৫১	৩৬৫
২১	মৌতোড়জোড় সেচ প্রকল্প	রঘুনাথপুর	৮৯০.৩৩	১৮৮.১৮	৬০০	২৫
২২	রামচন্দ্রপুর সেচ প্রকল্প	সাঁতুড়ি	১৬২০	৪৬৫.৪	১২৭১	৪০৭
২৩	বেকো সেচ প্রকল্প	কাশিপুর	১২১৪	৩৭২.৪২	৬০৪	৪৬৪
২৪	ফুটিয়ারি সেচ প্রকল্প	হুড়া	৯৩০.৮	২৬৭.১	১৪৪	২২
২৫	পাতলোই সেচ প্রকল্প	হুড়া	১৫০৭	৪২১.১৬	৪০	—
২৬	গোলমারাজোড় সেচ প্রকল্প	পুরুলিয়া	৮০৩	১৭১.২	৩৫০	৪০
২৭	তুরগা সেচ প্রকল্প	বাগমুন্ডি	৭০৮.২১৫	৪২১.৩৪	৭০৮.২১৫	১৮০
২৮	কয়রাবেড়া সেচ প্রকল্প	বাগমুন্ডি	৫২৬.১০৩	৫১৯.৫১	৮০৯.৩৮৯	৩৫০
২৯	আপার বান্দু সেচ প্রকল্প	আড়ষা	৩১৩.৬৪	২১২.৪৬	—	—
৩০	হনুমাতা সেচ প্রকল্প	বলরামপুর	২০২৪	৭৪৩.০২	১২৬৫	৪৬০
৩১	বরাভূম সেচ প্রকল্প	বরাবাজার	২০২৪	৭০৩.৬৩	২০৪৩	৯৩১
৩২	টটকো সেচ প্রকল্প	বান্দোয়ান	২০২৩.৪৭	৪৬৯.৪৫	১২৮০	৩৯০

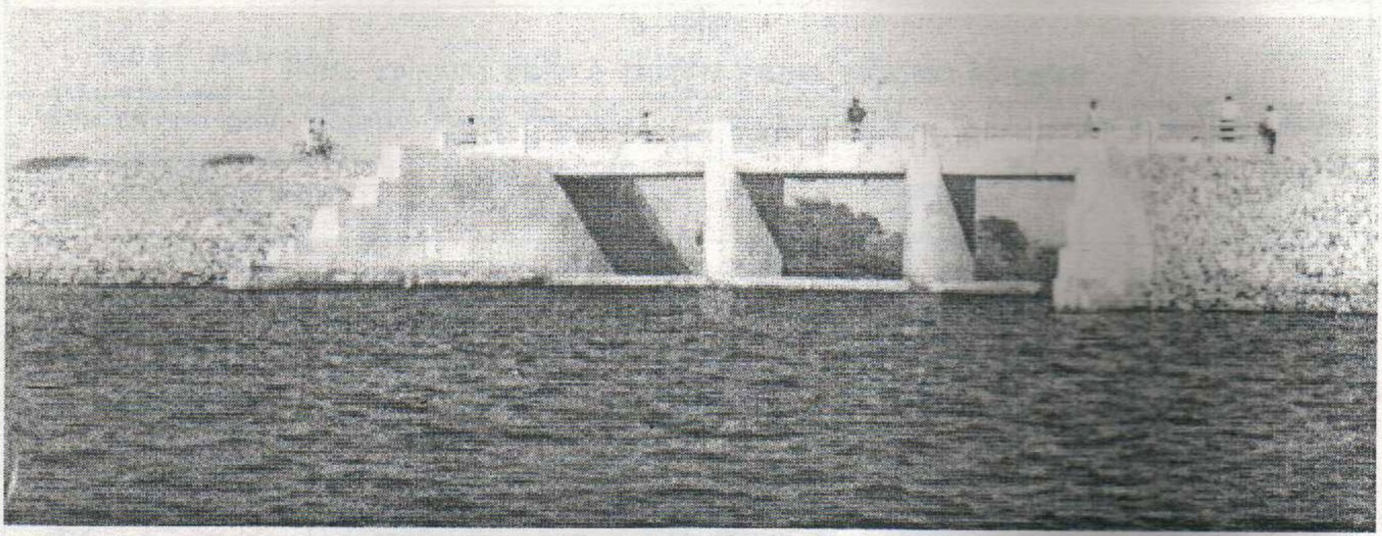

ফুটিয়ারি বাঁধ / সেচের নতুন দিগন্ত

সবুজায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। (সারনী-৬)

সারণি—৬ নূতন সেচপ্রকল্প তৈরীর খসড়া প্রস্তাব	
ক্রমিক সংখ্যা	নূতন সেচ প্রকল্প
১।	কারু সেচ প্রকল্প
২।	ডামবেড়া সেচ প্রকল্প
৩।	রাজবাঁধ সেচ প্রকল্প
৪।	দুধিয়াজোড় সেচ প্রকল্প
৫।	হোড়াই সেচ প্রকল্প
৬।	পাতাপাহাড়ী সেচ প্রকল্প
৭।	ড্যাংরা প্রসারিত সেচ প্রকল্প
৮।	পাথরপুরি সেচ প্রকল্প
৯।	শোভা সেচ প্রকল্প
১০।	শাফাই সেচ প্রকল্প
১১।	আতলা সেচ প্রকল্প

ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ফলে জলের যোগান বৃদ্ধি হয়ে যেমন চাষের কাজে সাফল্য এসেছে, তেমনি কৃষিতে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে প্রকল্পগুলির রূপায়ণের মাধ্যমে অন্যান্য শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে। জলাধারগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে মৎস্য চাষে। যার মাধ্যমে এলাকার বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হবার সম্ভাবনা রয়েছে। জলাধারগুলির চারিধারে বনসৃজনের মাধ্যমে যেমন রয়েছে অর্থ রোজগারের সম্ভাবনা তেমনি পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষারও কাজ করবে একই সঙ্গে। জলাধারগুলির জল ব্যবহার করে গড়ে তোলা যেতে পারে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ইতোমধ্যেই একটি বড় প্রকল্পের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে এই জেলায়। এইসব বিদ্যুৎকেন্দ্রের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে যেমন মিটবে এই জেলার বিদ্যুতের সমস্যা, তেমনি শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। চারিধারে ছোটো পাহাড়ের মাঝের সমতলে বনসৃজনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাবে যথেষ্ট। একধারে জলাধার আশপাশে ছোটো পাহাড় আবার বনের সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে জলাধার সংলগ্ন এলাকাতে গড়ে তোলা যেতে পারে পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে হোটেলশিল্প ও অন্যান্য শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছেও যথেষ্ট। ভ্রমণপিপাসু মানুষের আসা যাওয়া শুরু হলে নতুন সম্ভাবনাও সৃষ্ট হবে। এর মধ্য দিয়ে এলাকার দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটানোও সম্ভব হবে। সঠিক ও সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার রূপায়ণের মাধ্যমে আগামী দিনে এই জেলার মানুষের কল্যাণে এই জলাধারগুলি যে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের উন্নততর জীবনযাত্রায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

সেচ প্রকল্পগুলির মধ্যে গোলমারা-জোড়, পাতলোই, কয়রাবেড়া, মৌতোড়-জোড়, টটকো, ফুটিয়ারি, বেকো, হনুমাতা ও আপার বান্দু এই নটি সেচ প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। রুক্ষ শুষ্ক পুরুলিয়ার মাটিতে সবুজায়নের চ্যালেঞ্জের এ এক বিরাট সফলতা। এই সফলতা ধরে রাখার জন্যে প্রকল্পের জল সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং সময়মত রক্ষণাবেক্ষণেরও প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য যেমন রয়েছে ধারাবাহিক সরকারি উদ্যোগ, পাশাপাশি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে স্থানীয় কৃষকদের এবং এলাকার জনগণের। জলের অপচয় রোধ, সঠিক পরিমাণে জলের ব্যবহার করা, প্রকল্পের সকল স্ট্রাকচারগুলিকে সুরক্ষিত রাখা এবং ব্যবহারের জন্য জনসচেতনতা প্রয়োজন। সকলের সক্রিয় ভূমিকায় এবং সকলের অকুণ্ঠ সহ-যোগিতায় ভবিষ্যতে পুরুলিয়া জেলাকে সবুজায়নের শীর্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র :

1. West Bengal District Gazetteers, Puruliya.
2. Census of India—1981, 1991 & 2001.
3. Report on Puruliya by office of the O.S.D. Puruliya.

লেখক : অবর-সহ বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

বিশ্ববিচিত্রা

অঞ্জন দাশগুপ্ত

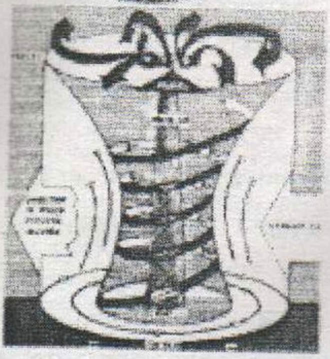

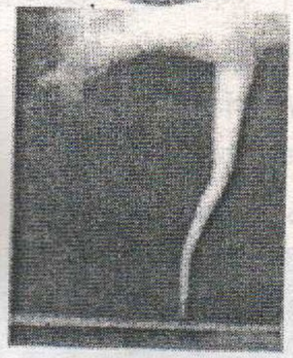

লাওসে নির্মিত হতে চলেছে বৃহদাকার ড্যাম

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি স্থলবেষ্টিত ছোট্ট দেশ লাওস। ২,৩৬,৮০০ বর্গ কিমি বিশিষ্ট দেশটির জনসংখ্যা ৫৩ লক্ষের মত। দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ অঞ্চলই অরণ্যবেষ্টিত। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান নদী মেকং অববাহিকার অন্তর্গত দেশটি। মেকং নদী-বিধৌত লাওস, তাই এই নদীর জলসম্পদের উপরে বিশেষভাবে নির্ভরশীল। মেকং অবশ্য দেশটিতে বর্ষার সময় প্রায়শই বন্যার সৃষ্ট করে। নদীটি পার্শ্ববর্তী দেশ থাইল্যান্ডের সঙ্গে অনেকটা দৈর্ঘ্য ধরে সীমানা নির্ধারণ করেছে। অর্থনৈতিকভাবে এই দরিদ্র দেশটিতে একটা বিরাট পরিবর্তন আসতে চলেছে বৃহদাকার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে। বর্তমানে দেশটিতে মেকং নদী অববাহিকায় ড্যামের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৭০০ মেগাওয়াট। নাম থেউল নামে যুগল ড্যাম নির্মাণের মধ্য দিয়ে দেশটিতে ৩০ বছরের মধ্যে ১২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। দেশের অর্থনীতিতে আসবে একটা বিরাট পরিবর্তনের জোয়ার। শিল্প স্থাপন এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে একটা বিরাট পরিমাণ বিদ্যুৎ বিক্রয় করতে পারবে লাওস। বিশ্বব্যাংকের ১২৫ কোটি মার্কিন ডলারের আর্থিক সহায়তায় এই ড্যাম নির্মিত হলে দেশটির আগামী পঁচিশ বছরে ২০০ কোটি ডলার অর্থ উপার্জন করা সম্ভব হবে। ড্যামটিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যাটারি নামে অভিহিত করা হচ্ছে। তবে ড্যামের ৪৫০ বর্গ কিমি বিশিষ্ট জলাধারটির প্রভাবে স্থানটিতে বসবাস-কারী ৬২০০ জন মানুষকে সরিয়ে নিতে হবে। এছাড়া দেশটির মধ্য-নাকাই মালভূমি অঞ্চলের আনুমানিক এক লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এছাড়া বিশাল অরণ্যানী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে যেখানে বসবাসকারী বিভিন্ন পশুপাখি ছাড়াও বিরল প্রজাতির প্রাণী সংকটে পড়তে পারে। সঠিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বিশ্বব্যাংক ৩[illegible] কোটি মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা দান করছে যার সাহায্যে সম্ভব হবে বিশাল বন সৃজন।

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে বন্যা

প্রকৃতিতে অঘটন প্রায়ই ঘটে। পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশটি ঊষর মরুভূমি অঞ্চল। প্রদেশটির উচ্চতা গড়ে ১৫০০ মিটারের উপর। বিস্তৃত সিন্ধু নদী উপত্যকাকে দক্ষিণে কির্তাহার পর্বতশ্রেণী এবং মধ্যদিকে সুলাইমাল পর্বতশ্রেণী আলাদা করছে বেলুচিস্তানের সঙ্গে পাদেশটি খুবই খরাপ্রবণ। কিন্তু এ বছরের প্রথমদিকে ফেব্রুয়ারি মাসে হল এক অঘটন। একনাগাড়ে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে পাকিস্তানের এই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশ বেলুচিস্তানের উপকূলবর্তী পাঁচটি গ্রাম ভেসে যায়। আবহবিদদের মতে গত ১৬ বছরে পাকিস্তানে এরকম বৃষ্টিপাতের নিদর্শন নেই। রাজধানী কোয়েটা শহরের প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দক্ষিণে আরব সাগর উপকূলবর্তী শহর পাসালি এলাকার সিন্ধি, পাসো, তুযাতি-সহ পাঁচটি গ্রাম বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মৃতের সংখ্যা শতাধিক। ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য চলে

জোরকদমে। প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বাঁধের জলধারণের ক্ষমতা পেরিয়ে গিয়ে ১৫০ মিটার লম্বা শাদিকোর বাঁধটি ভেঙে পড়ে এই বিপত্তি। জলের তোড়ে অনেকে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন বলে আশংকা করা হচ্ছে। এর ফলে সহস্রাধিক লোক নিখোঁজ।

স্পেনের বিস্তীর্ণ জলাভূমি অঞ্চল সংকটের মুখে

১,৯৫,০০০ বর্গ কিমি আয়তন বিশিষ্ট স্পেন ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলবর্তী দেশ। প্রধানত মালভূমি অঞ্চল, স্পেন দেশটি এব্রো, ডুয়েরো, গুয়াডিয়ানা এবং গুয়াদালকুইভির নদী বিধৌত দেশের মধ্যবর্তী কাস্তিল প্রদেশের লামানছায় এক সময়ে ২৫,০০০ হেক্টর বিশিষ্ট বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছিল। এখন এটি অতীতের একটি নিষ্ঠুর স্মৃতি—সংকুচিত হতে হতে এর এখন আয়তন গিয়ে দাঁড়িয়েছে কেবলমাত্র ৫৭০০ হেক্টর। বিভিন্ন প্রজাতির জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ, পাখিদের অস্তিত্ব তাই আজ বিপন্ন। গত চল্লিশ বছর ধরে অতি মাত্রায় ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করে গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচের জল সরবরাহের কারণে এই বিপত্তি। এখানে চাষের মধ্যে প্রধানত আলফালফা, যব, ভুট্টা, গম, বিট ইত্যাদি। ১৯৬০ সালে যেখানে ২৫,০০০ হেক্টর জমিতে চাষ হত, সেটি বেড়ে গিয়ে এখন ২,০০,০০০ হেক্টরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নলকূপের সংখ্যা ১৫০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯,০০০ হয়েছে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর গভীরভাবে নেমে গিয়েছে। এছাড়া স্পেনে নির্মিত হয়েছে ১২০০-র বেশি ড্যাম। যার সাহায্যে বহু দূরবর্তী স্থানে সেচ এবং বিস্তীর্ণ পুর এলাকায় পাইপের মাধ্যম জল পাঠানো হচ্ছে। আবার এব্রো নদী থেকে বছরে ১৪০ কোটি ঘনমিটার জল পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে স্পেনীয় সরকার। কিন্তু এর ফলে পরিবেশে নেমে আসতে পারে এক প্রচণ্ড বিপর্যয়—এমনই আশংকা করছেন বিজ্ঞানীরা। ভূগর্ভস্থ জলস্তরও বিরাটভাবে বিপন্ন হতে পারে। শিল্পের ক্রমাগত প্রসারের কারণে আজ দেশটিতে জলের চাহিদা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাচ্ছে। সরকারের ধারণা এব্রো নদী উপত্যকার মহতী পরিকল্পনার মাধ্যমে দক্ষিণ দিকের ভূগর্ভস্থ জল ভাণ্ডারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, উন্নত হবে জলস্তর। গভীর নলকূপ ব্যবহারের প্রবণতা কমে আসবে। কিন্তু পরিবেশবিদগণ মনে করেছেন এব্রো নদী ব-দ্বীপ অঞ্চলের বিরাট অবনতি হবে, কারণ যথার্থ প্রবাহ কমে থাকে। অতি মাত্রার সেচের ফলে আগেই নদীটির প্রভূত অবনতি হয়ে গেছে। স্পেনের পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর উপকূলে ১,৫০,০০০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ডোনানা নামে সর্ববৃহৎ জলাভূমির আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে জলসেচের কারণে এর আয়তন সংকুচিত হয়ে ৩০,০০০ হেক্টরে থেমে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য পরিবেশের সুষমা আনতে আজ জলাভূমি সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।

সংকলক : অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার

বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রকাশ করা হল :

ক)	*পত্রিকার নাম*	: সেচপত্র
খ)	*পত্রিকার ভাষা*	: বাংলা
গ)	*প্রকাশের স্থান*	: জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১
ঘ)	*প্রকাশ কাল*	: ত্রৈমাসিক
ঙ)	*মুদ্রাকরের নাম*	: সোমনাথ আগরওয়ালা
চ)	*মুদ্রাকরের জাতি ও ঠিকানা*	: ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১
ছ)	*প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা*	: সোমনাথ আগরওয়ালা, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১
জ)	*সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা*	: সুভাষ চন্দ্র দে, ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১
ঝ)	*স্বত্বাধিকারী*	: সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ঞ)	*স্বত্বাধিকারীর ঠিকানা*	: জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১

আমি, সোমনাথ আগরওয়ালা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর : সোমনাথ আগরওয়ালা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের পক্ষে সোমনাথ আগরওয়ালা, অধীক্ষক বাস্তুকার, কর্তৃক জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর থেকে প্রকাশিত ও বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে মুদ্রিত / ২৭.৯.২০০৫

পুরুলিয়া জেলার আড়ষা থানার সামুইডহর, কুলটার, সেনাবনা ইত্যাদি মৌজাসমূহে সেচ ও জলপথ দপ্তরের বান্দু সেচ প্রকল্পের মূল খালের সিমেন্ট কংক্রিট লাইনিং দ্বারা সংস্কার। কাজের প্রয়োজনীয় টাকা *রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা* প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত। এই লাইনিং-এর ফলে জলের অপচয় অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে এবং রবি চাষের ক্ষেত্রে কিছু অধিক জমিতে চাষের সুফল পাওয়া যাবে।

ছবিতে কাজের আগে ও তার পরের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

মূল খালের ৫৯২৮ মিঃ থেকে ৫৯৮৮ মিঃ পর্যন্ত

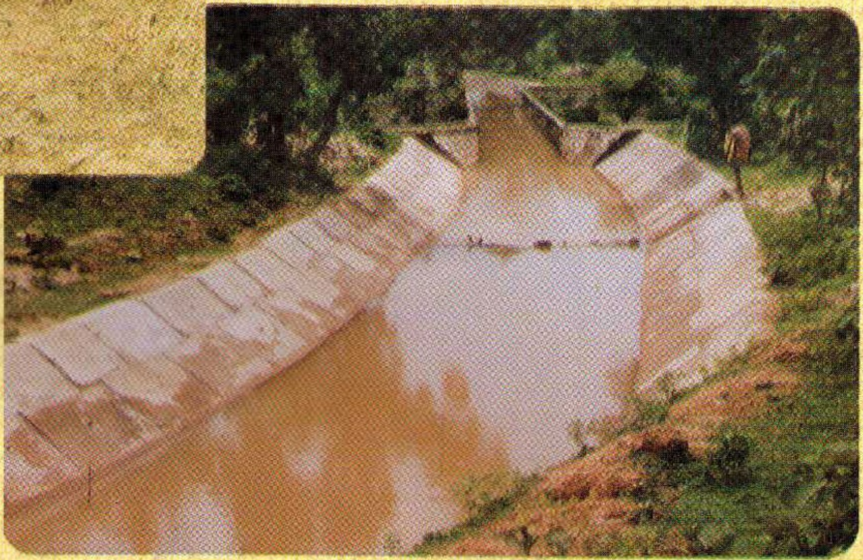

মূল খালের ৬২৮৯ মিঃ থেকে ৬৪২৯ মিঃ পর্যন্ত

REGD. NO. WBBEN/2000/1027 JANUARY–MARCH/APRIL–JUNE 2005